আরকান-রাজসভায়

বাঙ্গালা সাহিত্য

[খ্রীষ্টীয় ১৬০০—১৭০০ অব্দ]

ডক্টর্ মুহম্মদ্ এনামুল্ হক্, এম্-এ, পি-এচ্-ডি

এবং

সাহিত্য-সাগর আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট,

কলিকাতা।

(১৯৩৫ ইংরেজী)

উৎসর্গ

যেই

একনিষ্ঠ

বঙ্গবাণী-সেবকের

এক বিন্দু সহৃদয়তার অভাব ঘটিলে,

আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য

প্রকাশিত হওয়া দূরের কথা, লিখিত হইত কিনা সন্দেহ,

সেই মহানুভব

রায় খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর

মহোদয়ের

পুণ্য নাম বক্ষে ধরিয়া

এই ক্ষুদ্র পুস্তক

গৌরবান্বিত

হইল।

রায় বাহাদুর

শ্রীযুক্ত ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন, বি-এ, ডি-লিট্, মহাশয়-লিখিত

ভূমিকা

এ দেশের ইতিহাসের যতই সন্ধান হইতেছে, ততই আমরা বঙ্গদেশের গৌরব বেশী করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এক সময়ে বঙ্গভাষা পূর্ব্ব ভারতের বহুদূর পর্য্যন্ত রাজসভায় সম্মান পাইয়াছিল,—তাহা আলোচ্য পুস্তকখানি ও অপরাপর গ্রন্থদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর প্রভৃতির ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ বহু পণ্ডিত যে ত্রিপুরেশ্বরের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্যের সভায় ত্রিপুরার রাজমালা বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ত্রিপুরার স্বাধীন রাজারা সুচিরকাল হইতে তাঁহাদের রাজসভা ও অপরাপর প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালা ভাষায় সমস্ত দলিল-পত্র লিখাইতেন; এমন কি, তাঁহাদের তাম্র-শাসনেও বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষরে তাঁহাদের আদর্শ উৎকীর্ণ করাইতেন। আসামে সেদিন পর্য্যন্তও বঙ্গভাষায় জনসাধারণের শিক্ষাদীক্ষা নির্ব্বাহিত হইত। এক শতাব্দীও হয় নাই, কতকগুলি স্বার্থান্ধ পাদ্রীর চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা আসামে হতাদৃত হইয়াছে। বঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্তের উত্তুঙ্গ গিরিমালার সীমা অতিক্রম করিয়া, এই ভাষা প্রাচীন কালে আরকান দেশে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এদেশে বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চার সোণার ফল ফলিয়াছিল। গ্রন্থকারদ্বয় এই পুস্তকে এদেশের এই সময়কার বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চার যে অমূল্য ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়কে আশ্চর্য্যরূপে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে।

বঙ্গভাষার সম্প্রসারণ-শক্তি আশ্চর্য্য; ইহা প্রাচীনকাল হইতেই আপনাকে দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া দিয়াছিল। বালীদ্বীপের তাম্রশাসন ও শিলালিপিগুলি তৎসময়কার প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ। জাপানের পুরোহিতগণ ধর্ম্ম পুস্তক লিখিতে দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষর এখনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ সময়ে লিখিত একখানি পুথী "হুরিউজি" মন্দিরে পাওয়া গিয়াছিল। তাহা দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ সেন রাজদের তাম্রপটের অক্ষরের অনুরূপ। বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালীগণ পূর্ব্ব এসিয়ার সর্ব্বত্র তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালা ভাষা তথাকার বহুদেশে আদৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুদূর আরকানেও এই সময়েই বাঙ্গালা ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকিবে। এই পুস্তক হইতে সপ্তদশ শতাব্দীতে আরকানে বাঙ্গালা ভাষার যে উৎকর্ষতা দেখিতে পাই, তাহার ভিত্তি যে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ দেশে বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহভাবেই বলিতে পারা যায়।

এই পুস্তকখানি এবং বঙ্গপল্লীর প্রাচীন গীতিকাগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে, কিছুদিন পূর্ব্বেও বঙ্গভাষায় হিন্দু কি মুসলমানের নিজস্ব বলিয়া কোন ছাপ ছিল না—ইহা উভয় সম্প্রদায়েরই

মাতৃভাষা বলিয়া গণ্য ছিল; কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সঙ্গে ইহার একেবারেই সংস্রব ছিল না। এই পুস্তক হইতেই দেখা যাইতেছে, আরকানে মুসলমান কর্ম্মচারীরা আদর করিয়া এই ভাষাকে "দেশী ভাষা" নাম দিয়া সম্মান করিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরাগল খাঁর আশ্রিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং ছুটিখাঁর প্রিয় কবি শ্রীকরণ নন্দীও এই ভাষাকে "দেশী ভাষা" নাম দিয়াছিলেন। বাস্তবিকই এ ভাষা এদেশ-বাসীর মাতৃভাষা বলিয়া আদৃত ছিল। সেকালে গোঁড়া মোল্লা ও টুলো পণ্ডিত একদিকে আরবী ফারসী ও অপরদিকে সংস্কৃত শব্দের মল-মন্ত্রা ঢুকাইয়া বাঙ্গালা ভাষার কেল্লা দখল করিতে প্রয়াস পান নাই। পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) "মাণিকতারা" নামক পালায় জামাইৎ উল্লা যে অপূর্ব্ব কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সমকক্ষতা করিতে পারে, এইরূপ হিন্দু কবির সংখ্যা অতি অল্প। এই পুস্তকে লেখকদ্বয় কবি দৌলত কাজীর (১৬২২-১৬৩৮ খ্রীঃ, আবির্ভাব কাল) "সতী ময়না" নামক কাব্যের যে অপূর্ব্ব কবিত্ব-সম্পদের কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই বুঝিবেন যে, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির কৃতিত্ব ও গৌরব যতটা হিন্দুর ততটা মুসলমানের। ইঁহাদের এক সম্প্রদায় যদি তাহাদের স্বীয় সৃষ্ট কীর্ত্তি হইতে কোন অজুহাতে সরিয়া দাঁড়ান, তবে তাঁহারা উত্ত-রাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবেন মাত্র।

এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন সাহিত্যরথী মৌলভী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ,— তিনি দ্রোণাচার্য্য সদৃশ এবং তাঁহার সহকর্ম্মী মুহম্মদ এনামুল হক্ এম-এ (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত), পি-এচ--ডি,—ইনি অর্জ্জুনতুল্য। এই প্রবীন ও নবীনকৃতিদ্বয়ের গবেষণা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের অনেক অজ্ঞাত তত্ত্ব যে আবিষ্কৃত হইবে, তাহা আমরা অনেকদিন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম; সে সময় হইতে আমরা তাঁহাদের নূতন আবিষ্কারের সহিত পরিচিত হইবার জন্য সোৎসুক মনে প্রতীক্ষা করিতে-ছিলাম। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় এই মূল্যবান পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ায়, আমাদের সে ঔৎসুক্য আংশিকভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের এই নবীন অবদানখানি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর অবশ্যই পঠিতব্য।

বেহালা,
চব্বিশ পরগণা,
নভেম্বর, ১৯৩৪ ইংরেজী

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন

গ্রন্থকারদ্বয়ের বক্তব্য

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙ্গালা সাহিত্য বিকাশের ধারা বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। এই পর্য্যন্ত, এই সমুদয় ধারার আবিষ্কারে যে গবেষণা চলিয়াছে, তদ্দারা বাঙ্গালা সাহিত্য-বিকাশের কয়েকটি দিক সম্বন্ধে একটি মোটামোটি ধারণা জন্মে মাত্র। বাঙ্গালা সাহিত্যের যাবতীয় বিকাশের রূপ আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর নিকট সম্যক্‌রূপে ফুটিয়া উঠে নাই,—একথা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। তাই, আজ পর্য্যন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্যের যে সকল ইতিহাস বা ঐতিহাসিক আলোচনা লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই পূর্ণাঙ্গ নহে। এ বিষয়ে বাঙ্গালীর গবেষণা করিবার অবকাশ বা সুযোগ বেশী নাই বটে, কিন্তু ইহার ক্ষেত্র এতই সম্প্রসারিত যে, বহু পণ্ডিত বহু বর্ষ ধরিয়া একাজে লিপ্ত থাকিলেও, ইহার সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করিতে পারেন কিনা, বলা যায় না।

প্রধানতঃ, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা এ কাজে হস্তক্ষেপ করি। মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্য-বিকাশের নূতন ধারা আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে করিতে ইহার একটি নূতন ও অজ্ঞাত দিক আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয়;—এই দিক বাঙ্গালা দেশের বাহিরে বাঙ্গালা সাহিত্য-বিকাশের দিক। এই নূতন পথে অগ্রসর হইতে গিয়া, হাতের কাছে যে সকল উপাদান লাভ করিয়াছি তাহাতে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আরকান অর্থাৎ রোসাঙ্গ দেশে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্প্রসারণ, সমাদর ও সম্মানের কথাই প্রমাণিত হইয়া গেল। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে যেমন গৌরবের কথা, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষেও তেমন গৌরবের বিষয়। কেন না, সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদেশে, ভিন্ন ভাষাভাষী লোকের মধ্যে, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য কতখানি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান পুস্তক হইতেই দেখা যাইবে।

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান পুস্তকখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস নহে; ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অজ্ঞাত দিকের অংশ বিশেষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পুস্তক মাত্র। সুতরাং, ইহা এই দিক হইতেই বিচার্য্য। এই দিকটির এই অংশ বিশেষের প্রতি পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই আমরা এই পুস্তকটির প্রচার করিলাম।

এই জাতীয় পুস্তকে সাধারণতঃ প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত অংশগুলির বানানে হস্তক্ষেপ করা হয় না। ইহার ফলে জনসাধারণের নিকট এই জাতীয় পুস্তকগুলি মোটেই সমাদর লাভ করে না। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে হস্তক্ষেপ না করিয়া, আবশ্যক মত স্থানের উদ্ধৃত অংশের সংস্কৃতমূলক শব্দগুলির বানানে আমরা আধুনিক রূপ দান করিয়াছি বলিয়া পণ্ডিত সমাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। স্থানে স্থানে এহেন সংস্কার-সাধনের ফলে, পুস্তকটি সর্ব্বসাধারণের নিকটও অপেক্ষাকৃত সুপাঠ্য হইবে বলিয়া আশা করি।

অতীব দুঃখের বিষয় এই, "প্রুফ" দেখার গণ্ডগোলে পুস্তকখানি হইতে মুদ্রাকর প্রমাদ দূরীভূত করিতে পারিলাম না বলিয়া, ইহাতে বহু বর্ণাশুদ্ধি ও বিস্তর দোষ-ত্রুটি রহিয়া গেল। প্রার্থনা করি, সুধী পাঠক এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। পুস্তকের শেষভাগে একটি শুদ্ধি-পত্রও দেওয়া হইল।

এই পুস্তক প্রণয়নের জন্য আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট নানাভাবে ঋণী। এই জন্য, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া বঙ্গবাণীর অমর সন্তান শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এহেন গৌরব লাভ করায়, আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

বিনীত—

আবদুল করিম

মুহম্মদ এনামুল হক।

চট্টগ্রাম—

১লা মার্চ্চ, ১৯৩৫ ইং

অধ্যায়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

আরকান রাজসভা—১-১২

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবি

প্রথম প্রসঙ্গ :—

দৌলত কাজী বা কাজী দৌলত—১৩—২৮

তৃতীয় অধ্যায়

রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবি

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ :—

কোরেশী মাগণ ঠাকুর—২৯—৪৩

চতুর্থ অধ্যায়

রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবি

তৃতীয় প্রসঙ্গ :—

মহাকবি আলাওল—৪৪—৫৯

পঞ্চম অধ্যায়

রোসাঙ্গ-রাজসভায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

পরিশিষ্ট (ক)

পরিশিষ্ট (খ)

নাম-সূচী

আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য

(১৬০০—১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রথম অধ্যায়

আরকান-রাজসভা।

আরকানের অধিবাসীরা সাধারণভাবে বাঙ্গালা দেশে "মগ" বা "মঘ"(১) নামে পরিচিত। মঙ্গলয়েড্ (গোত্র Mongoloid race) ভুক্ত আরকানবাসীরা তাহাদিগকে এই নামে পরিচয় দেন না; এমন কি এই নাম সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু অবগতও নহেন। নৃতত্ত্ব (Ethnology) অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী মঙ্গলয়েড গোত্রভুক্ত সমুদয় আরকানবাসীকে এই "মঘ" নামে পরিচিত করিয়া ভুল করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই(২)। তবে কতিপয় প্রাচীন আরকানবাসীকে (যাঁহাদের অধিকাংশ লোক এখন "রাজবংশী" নামে পরিচয় দিয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে বাস করিতেছেন) "মঘ" নামে অভিহিত করিবার সার্থকতা আছে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা "মগধ" দেশ হইতে আরকানে গমন করিয়া কিছুদিন তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। সুতরাং ইহারা "রাজবংশী" ও "মঘ" উভয় নামে খ্যাত হইতে পারেন। চট্টগ্রাম ও আরকানের এই "রাজবংশীরা" জাতিতে আর্য্য ও গোত্রে "মগ" বা "মঘ" ছিলেন(৩)। কালক্রমে ইহাদের স্বার্থ মঙ্গলয়েড্ গোত্রভুক্ত সমুদয় আরকানবাসীর স্বার্থের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া পড়ায়, সমগ্র আরকানবাসী সাধারণভাবে "মঘ" নামে পরিচিত হইয়াছিল।

"মঘ" বা আরকানবাসী।

এই "মঘ" বা আরকানবাসীরা বাঙ্গালীর নিকট সুনাম লইয়া পরিচিত নহে। বাঙ্গালীরা আজিও ভীতি ও বীতশ্রদ্ধতার সহিত "মঘ" নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষায় "মঘের মুলুক" কথাটি অতি সুপরিচিত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে "মঘ" অর্থাৎ আরকানবাসীরা বঙ্গের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জেলাসমূহে জলদস্যুর বেশে যে ভীষণ উপদ্রব করিয়াছিল, বাঙ্গালী প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে ধন প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেও, আজ পর্য্যন্ত অত্যাচারী ও জলদস্যু "মঘ"দের কথা একেবারে ভুলিতে পারে নাই। "মঘে"রা এহেন অখ্যাতি

"মঘ"দের সহিত নূতন পরিচয়।

---

(১) চট্টগ্রাম হইতেই "মগ" শব্দ যে বাঙ্গালায় সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। চট্টগ্রামবাসীরা 'মগ' ও "মঘ" এই উভয় প্রকারে শব্দটিকে উচ্চারণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু লেখাপড়ায় সর্ব্বত্র সন লিখিতে গিয়া "মঘী" সন বলিয়াই লিখিয়া থাকেন। সুতরাং লিখিবার সময় শব্দটি "মঘ" রূপে লেখাই সমীচীন।

(২) History of Burma—Lt. Col. A. P. Phayre (1884, London). pp 47-48

(৩) Ibid.

লইয়া আমাদের নিকট পরিচিত হইলেও, আজ তাহাদের সহিত আমাদের যে নূতন পরিচয় হইবে, ইহা দ্বারা "মঘ"দের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধার ভাব আংশিকভাবে বিলুপ্ত হইবে বলিয়া আশা করি।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গের মাঠ, ঘাট, বাট সর্ব্বত্র যখন বৈষ্ণবীয় ভাবে ভরপূর, বৈষ্ণবীয় কবিতার ললিত পদ-বিন্যাসে, সহস্র প্রকারে, অজস্রভাবে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী বর্ণনায় নরহরি সরকার (১৪৫৮—১৫৪০ খ্রীঃ), গোবিন্দ দাস (১৫৩৭ বা ১৫১৫—১৬১০ খ্রীঃ), জ্ঞানদাস (জন্ম ১৫৩০ খ্রীঃ), যদুনন্দন দাস (জন্ম ১৫৩৭ খ্রীঃ) প্রেমদাস, কবিশেখর প্রভৃতি খ্যাতনামা বৈষ্ণব কবিগণ যখন বাঙ্গালা দেশ হইতে পদাবলী ব্যতীত অন্যবিধ সাহিত্য-রচনাকে একরূপনির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন, তখন বঙ্গ-ভারতী বাঙ্গালার কমল-বন পরিত্যাগ করিয়া সুদূর আরকানের পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যেই "মঘে"রা আজও বাঙ্গালীর নিকট বর্ব্বর, অসভ্য ও জলদস্যু বলিয়া পরিচিত, সেই "মঘ" রাজাদের রাজসভায় সে সময়ে বঙ্গ-ভারতী অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্যামল প্রকৃতির লীলা-নিকেতন আরকানের বনানী ও পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশটিকে তিনি বাঙ্গালার কমল-বন হইতে কম ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কেন না সপ্তদশ শতাব্দীতে আরকানের রাজসভায় বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ নানা দিক দিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার আপন ভূমিতে ইহা তেমনটি হয় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঙ্গালা ভাষার এই আরকান-প্রবাসকালে, ইহা আরকান-রাজের মুসলমান সভাসদ, ও পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রধানতঃ চট্টগ্রাম বিভাগের মুসলমান কবিদের হাতেই বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। আমরা পরে দেখিতে পাইব, আরকান-রাজসভার মুসলমান কবিদের হাতেই বাঙ্গালা ভাষা নূতন রূপ ও নবীন প্রেরণা লাভ করে। বিদেশে বিজাতীয়দের হাতে বাঙ্গালা ভাষার এই বিকাশকে সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে, প্রধানতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর আরকানের ইতিহাস এবং তাহার উপর মুসলমান-প্রভাবের সূত্র সর্ব্বপ্রথমে জানিয়া লওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে নিম্নে আমরা অতি সংক্ষেপে আরকানের আবশ্যকীয় ইতিহাস ও তথায় মুসলমানদের প্রভাবের কথার অবতারণা করিতেছি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরকানে মুসলমানদের হাতে বাঙ্গালা ভাষার বিকাশ।

আমরা আজকাল "আরকান" বলিতে চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব্ববর্ত্তী যে বঙ্গ-প্রত্যন্ত প্রদেশটিকে বুঝিয়া থাকি, আরকানবাসীরা পূর্ব্বে এই দেশটিকে এই নামে চিনিতেন না। তাঁহারা তাঁহাদের দেশকে "রখইঙ্" (Rakhaing) নামে অভিহিত করিতেন (১)। ইহা সংস্কৃত "রক্ষ" এবং পালি "যক্‌খো" অর্থাৎ যক্ষ শব্দ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; বৌদ্ধেরা লঙ্কা বা সিংহল জয় করিবার পূর্ব্বে এদেশের আদিম অধিবাসীকে এই নামে অভিহিত করিতেন; ভারতীয় আর্য্যেরা আরকানবাসী "দ্রবিড়" ও "মঙ্গল" জাতীয় লোকদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে এই নামে অভিহিত করিতেন বলিয়া মনে হয়; এখনও আরকানবাসীরা "রখইঙ্" শব্দে দৈত্য বা রাক্ষস বুঝিলেও, তাঁহাদের দেশকে "রখইঙ্-তঙ্গী" (Rakhaing-tainggyi) অর্থাৎ "রখইঙ্" বা রাক্ষস ভূমি নামে

বাঙ্গালা সাহিত্যের "রোসাঙ্গ"।

(১) J. A. S. B., Vol XIII, part 1, 1844, p. 24

পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন না (১)। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের হাতে আরকানে যখন বঙ্গ সাহিত্য পরিপুষ্ট হইতেছিল, তখন মুসলমান কবিগণ এদেশকে "রোসাঙ্গ"("রখইঙ্গ্" শব্দের অপভ্রংশ) নামে পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং এই "রোসাঙ্গ" নাম তাঁহাদের সৃষ্ট নাম নহে; ইহা আরকানেরই প্রাচীন নাম। আমরা এই জন্যই আরকানকে "রোসাঙ্গ" নামে অভিহিত করিবার পক্ষপাতী, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বত্র এই নামই ব্যবহার করিয়াছি।

রোসাঙ্গে ও আধুনিক চট্টগ্রাম বিভাগে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মুসলমান-প্রভাব সুস্পষ্ট। খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হইতেই পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত আরববাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতে থাকে।

রোসাঙ্গ ও চট্টগ্রামে প্রাচীনতম মুসলমান-প্রভাব—খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী।

এই সময়ে পূর্ব্বভারতের একমাত্র বন্দর চট্টগ্রাম আরবদের বিশ্রামস্থান ও উপনিবেশে পরিণত হয়। সুলয়মান (৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত), আবু জায়দুল্ হাসন্ (সুলয়মানের সমসাময়িক), ইবনু-খুর্দবা (মৃঃ ৯১২ খ্রীঃ), আল্-মস্‌‌উদী (মৃঃ ৯৫৬ খ্রীঃ), ইবনু হাওকল্ (৯৭৬ খ্রীঃ তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখেন), আল্-ইদ্‌রিসী (জন্ম, একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ) প্রভৃতি প্রাচীন আরব-পরিব্রাজক ও ভৌগোলিকদিগের(২) লিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, আরকান হইতে মেঘনা নদীর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগটি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরবী বণিকদিগের কর্ম্মতৎপরতায় ভরপূর হইয়া উঠে। এ কথাটি আমরা রোসাঙ্গের জাতীয় ইতিহাস হইতেও জানিতে পারিতেছি: রোসাঙ্গ-রাজ মহতইঙ্গ্ ৎচন্দয়ত্র (Mahatoing Tsandaya—788-810 A. D) যখন খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন কতকগুলি মুসলমান বণিক "রন্‌বী" দ্বীপে অর্থাৎ আরকানের দক্ষিণদিকস্থ আধুনিক "রাম্‌রী" দ্বীপে জাহাজ ভাঙ্গিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহারা আরকান-রাজের সম্মুখে নীত হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে গ্রামে গিয়া বাস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন(৩)। খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে আরকানে ইসলাম-বিস্তৃতি ও মুসলমান-প্রভাব অন্যান্য ঐতিহাসিক কর্ত্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছে(৪)। এই সময় হইতেই, আসামের সীমা হইতে মালয় উপদ্বীপ পর্য্যন্ত সমুদ্র-তীরবর্ত্তী ভূভাগের নানা স্থানে "বুদ্ধের মোকাম" নামক এক প্রকার অদ্ভুত মসজিদ গড়িয়া উঠিতে থাকে; এই মসজিদগুলিকে বৌদ্ধ, চীনা ও মুসলমান জাতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে(৫)। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রামে আরব-প্রভাব এতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, এই অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র মুসলমান-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, এবং এই ক্ষুদ্র মুসলমান-রাজ্যের অধিপতি "সুলতান" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ মেঘনা নদীর পূর্ব্ব তীর হইতে নাফ্ নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ভূভাগ তখন এই আরব "সুলতানের" অধীনে ছিল। এই "সুলতানের" অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা রোসাঙ্গবাসীর জাতীয়

(১) (i) Ibid.
(ii) History of Burma—Lt. Col. A. P. Phayre (1884, London). p 43
(২) Elliot and Dowson. Vol I.
(৩) J. A. S. B., Vol. X, part I, 1844, p. 36
(৪) History of Burma—G. E. Harvey, I. C. S., 1925, p. 137
(৫) Ibid.

ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। খ্রীষ্টীয় ৯৫৩ অব্দে রোসাঙ্গ-রাজ সুলতইঙ্ ৎচন্দয়অ (৯৫১-৯৫৭ খ্রীঃ) স্বীয় রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালাভিমুখে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া "থুরতন"কে ("সুল্তান" শব্দের আরকানী অপভ্রংশ) পরাজিত করেন, এবং দিগ্বিজয়ের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ "চেত্তগৌং" অর্থাৎ চট্টগ্রাম নামক স্থানে এক প্রস্তরনির্ম্মিত বিজয়-স্তম্ভ স্থাপন করিয়া পাত্র-মিত্রের অনুরোধে স্বরাজ্যে ফিরিয়া যান(১)। এই "চেত্তগৌং" তাঁহার বিজিত স্থানের শেষ সীমা ছিল। কারণ, রোসাঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের মতে "চেত্তগৌং" শব্দের অর্থ "যুদ্ধ করা অনুচিত"(২)। আধুনিক চট্টগ্রাম জেলার নাম, এই "চেত্তগৌং" শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন(৩)।

এইরূপে খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হইতেই, মেঘনা নদীর পূর্ব্ব তীর হইতে আরম্ভ করিয়া রোসাঙ্গ দেশ পর্যান্ত ধীরে ধীরে ইস্লাম ধর্ম্মের বিস্তৃতি ও মুসলমান-প্রভাব সম্প্রসারিত হইতে থাকে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মিসর দেশীয় ভারত পর্য্যটক ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের লিখিত বিবরণ হইতেও জানিতে পারা যায়, তখন পর্যান্ত "মুর" অর্থাৎ আরবদের প্রভাব এতদঞ্চলে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বঙ্গে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমান রাজত্ব সংস্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালার এই প্রত্যন্ত প্রদেশটিতে ইস্লাম-বিস্তৃত হইতে থাকে। বঙ্গে মুসলমান রাজত্ব সংস্থাপনের পর ইসলাম-বিস্তৃতি যে এতদঞ্চলে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই দেখিতে পাই, বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বাগ্রে এতদঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যেই বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে এতদঞ্চলের মুসলমানেরা বাঙ্গালা ভাষার সাধনায় প্রত্যক্ষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তকাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমাদের নিকট আছে।

বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে চট্টগ্রামী মুসলমানই বাঙ্গালা চর্চ্চায় অগ্রণী।

এই যে মুসলমানদের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ হইল, ইহা সপ্তদশ শতাব্দীতে রোসাঙ্গ-রাজ-সভাসদ্‌গণের অনুগ্রহে চরমোৎকর্ষ লাভ করে। বলা বাহুল্য রোসাঙ্গ-রাজসভা ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই মুসলিম্-প্রভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতেই রোসাঙ্গ-রাজসভা ভাগ্যচক্রে পড়িয়া মুসলমান-প্রভাবকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হয়। রোসাঙ্গ-রাজ মেঙৎ-চৌ-মৌন (Meng-tsau-mwun ১৪০৪-১৪৩৪ খ্রীঃ) [ইনি বর্ম্মা ইতিহাসে নরমিখ্‌ল = Narameikhla নামে পরিচিত(৪)] খ্রীষ্টীয় ১৪০৪ অব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়া অনন্থিউ (Anan-thiu) নামক কোন সামন্ত রাজের ভগ্নী চৌবোঙ্গিও (Tsau-bongyo) নাম্নী রমণীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে, অনন্থিউ ভগ্নীর

রোসাঙ্গ-রাজসভায় মুসলমান-প্রভাব

(১) J. A. S. B., Vol XIII, part 1, 1844, p. 36
(২) Ibid.
(৩) Eastern Bengal District Gazetteers—Chittagong, 1908, p. 1,
(৪) History of Burma—G. E. Harvey, I. C. S. 1925, p. 130

প্রতি এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার মানসে আভারাজ মেঙৎ-শোঅই বা মিন্‌কৌং (Meng-tshwai = Minhkaung—1401-1422 A. D)এর নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করেন। মেঙৎ-শোঅই ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া রোসাঙ্গ আক্রমণ পূর্ব্বক রাজা মেঙৎ-চৌ-মৌন্‌কে ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত করেন। মেঙৎ-চৌ-মৌন পলাইয়া গিয়া গৌড়ের সুলতানের শরণাগত হইলেন (১)। এই সময়ে গৌড়ে ইলিয়াসশাহী বংশের সুলতান দ্বিতীয় শমসুদ্দীন (১৪০৬-১৪০৯ খ্রীঃ) রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি রোসাঙ্গ-রাজ মেঙৎ চৌ-মৌন্‌কে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করিয়া আশ্রয় দান করিলেন। রোসাঙ্গ-রাজ চব্বিশ বৎসর যাবৎ অর্থাৎ ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ে মুসলমান সুলতানদের আশ্রয়ে বাস করেন। ইতিমধ্যে গৌড়ে একটি রাষ্ট্রবিপ্লব অনুষ্ঠিত হইল; রাজা গণেশ (১৪০৯-১৪১৪ খ্রীঃ) গৌড় সিংহাসন অধিকার করিলেন; জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শাহ্ শর্কী রাজা গণেশকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিলেন। সম্ভবতঃ এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে, রোসাঙ্গ-রাজ গৌড়ের সুলতানকে সাহায্য করিয়াছিলেন (২)। এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরে, গৌড় সিংহাসনে জলালুদ্দীন মহম্মদ শাহ (১৪১৪-১৪৩১ খ্রীঃ) আরোহণ করিলেন; দেশে শান্তি স্থাপিত হইল। এই জলালুদ্দীন মহম্মদ শাহই ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ালী খাঁ (রোসাঙ্গ-ইতিহাসের উলু-খেঙ = Ulu-Kheng) নামক সেনাপতিকে সঙ্গে দিয়া আরকান-রাজ মেঙৎ-চৌ-মৌনকে স্বরাজ্য উদ্ধার করিতে পাঠাইয়া দেন। ওয়ালী খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ৎচেঙকা (Tsenka) নামক কোন আরকান-সামন্তের সহিত একযোগে মেঙৎ চৌ-মৌন্‌কে বন্দী করেন (৩)। রোসাঙ্গ রাজ কৌশলে কারামুক্ত হইয়া আবার বঙ্গদেশে পলাইয়া যান; আবার সুলতান দুইজন সেনাপতিকে সঙ্গে দিয়া রোসাঙ্গ-রাজকে স্বরাজ্য উদ্ধারে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতিদ্বয় বিশ্বাসঘাতক ওয়ালী খাঁকে বধ করিয়া, মেঙৎ-চৌ-মৌনকে ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে রোসাঙ্গ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন (৪)। রোসাঙ্গ-রাজ স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি গৌড়ের সুলতানের করদরাজ-শ্রেণীভুক্ত হইতে বাধ্য হইলেন (৫)। তাঁহার সঙ্গে যে সকল মুসলমান রোসাঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ম্রোহৌঙ (Mrohaung) নামক স্থানে "সন্ধিকন্" (Sandihkan) মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত করেন (৬)।

মেঙৎ-চৌ মৌন্ অর্থাৎ নরমিখ্‌ল মুসলমানদের সাহায্যে হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া চারি বৎসর (১৪৩০-১৪৩৪ খ্রীঃ) গৌড়ের সুলতানের করদরাজরূপে রাজত্ব করিলেন। এই সময় হইতে, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী রোসাঙ্গ-রাজগণ আপন বৌদ্ধ নামের সহিত একটি করিয়া মুসলমানী নাম ব্যবহার করিবার এবং তাঁহাদের মুদ্রার একপৃষ্ঠে ফারসী অক্ষরে ইস্‌লামী "কলেমা" ও মুসলমানী নাম লিখিবার প্রথা প্রচলিত করেন (৭)।

(১) J. A. S. B. Vol. XIII, part I, 1844. p. 44
(২) (i) Ibid.—p. 45.
(ii) History of Burma—Lt. Col. A.P. Phayre (1841, London) pp 77-78
(৩) J. A. S. B. Vol. XIII., part 1, 1844. p. 45
(৪) (i) Ibid
(ii) History of Burma—Lt Col. A P Phayre p 78
(৫) J. A. S. B. Vol. XIII, part 1, 1844. p. 46
(৬) History of Burma—G. E Harvey, I C S. 1925 p. 130
(৭) Ibid. p. 140.

হয়ত নরমিখ্‌ল মুসলমানদের করদরাজা বলিয়া এই প্রথার প্রচলন ও সমর্থন করিতেন; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে—তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেও, এই প্রথার উচ্ছেদ করেন নাই। তাই দেখিতে পাই, নরমিখ্‌ল-এর ভ্রাতা মেন্‌-খরী (১৪৩৪-১৪৫৯ খৃঃ) স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াও "আলী খাঁ" নামে পরিচিত হইতেছেন (১)। আরও দেখা যায়ঃ—

বৌদ্ধ নাম	মুসলমানী নাম	রাজত্বকাল
বচৌপিউ (Basawpyu)	কলিমা শাহ্ (২)	১৪৫৯-৮২ খ্রীঃ
মেঙ্‌-বেঙ্‌ = মিন্‌-বিন্ (Mengbeng = Min-bin)	সুলতান (৩)	১৫৩১-৫৩ ,,
মেঙ্‌-ফলৌঙ্‌ (Meng-Phalaung)	সিকান্দর শাহ (৪)	১৫৭১-১৫৯৩ ,,
মেঙ্‌-রাদ্‌জা-গ্যি (Meng-Radza-gyi)	সলীম শাহ (৫)	১৫৯৩ ১৬১১ ,,
মেঙ্‌-খা-মৌঙ্‌ (Meng-Kha-moung)	হুসয়ন শাহ (৬)	১৬১২-১৬২২ ,,
থিরী-থু-ধম্মা (Thiri-thu-dhamma)	দুষ্পাঠ্য ফারসী নাম (৭)	১৬২২-১৬৩৮ ,,
নরপদিগ্যি (Narapadigyi)	ঐ (৮)	১৬৩৮-১৬৪৫ ,,

উপর্য্যুক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে, ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর যাবৎ স্বাধীন আরকান রাজগণ তাঁহাদের মুদ্রায় মুসলমানী নাম ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। এই দুইশত বৎসর ধরিয়া বঙ্গের মুসলমানশক্তির সহিত স্বাধীন আরকান-রাজগণের মোটেই সদ্ভাব ছিল না; অথচ তাহারা দেশে মুসলমানী রীতি ও আচার মানিয়া আসিতেছিলেন। ইহার কারণ,—আরকান-রাজগণ তাঁহাদের সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচার-ব্যবহার হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মুসলমান সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচার-ব্যবহারের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে জানিতে পারিতেছি,—বঙ্গীয় মুসলমান রাজশক্তির সহিত আরকান-রাজগণের সম্বন্ধ মোটেই সন্তোষজনক না থাকিলেও, মুসলমান জাতির প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ ত ছিলই না, বরং তৎস্থলে তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তাই, তাঁহারা তাঁহাদের সৈন্যবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক বিশিষ্ট বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর পদ মুসলমানদিগের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

রোসাঙ্গ-রাজসভায় মুসলমান প্রভাব প্রবেশের কারণ।

মোটকথা, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রোসাঙ্গ-রাজসভায় যে মুসলমান-প্রভাব প্রবল বেগে প্রবেশ

(১) Ibid.
(২) J. A. S. B., Vol XV, 1846, p. 232
(৩) History of Burma—G. E. Harvey, I. C. S. p. 140
(৪) History of Burma—Lt. Col. A. P. Phayre p. 173
(৫) J. A. S. B., Vol. XV, 1846 p. 233
(৬) Ibid p. 234
(৭) Ibid. p. 234.
(৮) Ibid. p. 234.

করিল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সাধারণ মুসলমান-প্রভাবকে সঙ্গে লইয়া পরবর্ত্তী শতাব্দীগুলিতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছিল। এই বর্দ্ধন-শক্তি ধীরে ধীরে এমনই প্রবল আকার ধারণ করিল যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আসিয়া এই শক্তি উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইল। এই শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য রোসাঙ্গ-রাজসভায় মুসলমানদের চরম প্রভাবের পূর্ণচ্ছবি প্রদান করিতেছে। এই শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে আরকান-রাজসভায় মুসলমান-প্রভাবের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সপ্তদশ শতাব্দীর রোসাঙ্গ-রাজ সভায় মুসলমান-প্রভাবের ধারা।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রোসাঙ্গ-রাজের যে-সকল মুসলমান সভাসদ্ বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চায় স্বজাতীয় কবিকে নিয়োজিত করিয়া মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, সেই রোসাঙ্গ-রাজদের নাম এইরূপ :—

আরকানী নাম	বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত নাম	রাজত্বকাল
থিরী থু-ধম্মা রাজা—(Thiri thu-dhamma Raja)	শ্রীসুধর্ম্ম রাজা	১৬২২-১৬৩৮ খ্রীঃ
মিন্ সানি (Min Sani)	×	১৬৩৮ (২৮ দিন মাত্র)
নরপদিগ্যি (Narabadigyi)	নৃপতিগিরি, নৃপগিরি	১৬৩৮-১৬৪৫ খ্রীঃ
থদো = থদো মিন্তার (Thad Thado Mintar)	চাদেভ্, ছদো উমাদার	১৬৪৫-১৬৫২ খ্রীঃ
সান্দ থুধম্মা (Sanda Thudhamma)	চন্দ্র সুধর্ম্মা	১৬৫২-১৬৮৪ খ্রীঃ

রোসাঙ্গ-রাজ থিরী-থু-ধম্মা রাজা (১৬২২—১৬৩৮ খ্রীঃ) তদীয় পিতা মেঙ্-খা-মৌঙ্ বা হুসয়ন শাহের (১৬১২—১৬২২ খ্রীঃ) ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় মুসলমানী নাম ধারণ করিতেন; দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। তাহার রাজ্য ঢাকা হইতে পেগু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল (১)। তাহারই রাজত্বকালে আশরফ খানের আদেশে রোসাঙ্গ-রাজসভায় থাকিয়া কবি দৌলত কাজী তাহার অসমাপ্ত কাব্য "সতী ময়না" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন (২)। থিরী-থু-ধম্মা রাজার বংশ ধর্ম্ম, ধর্ম্মাচার, প্রবল প্রতাপ, ও সুবিচার সম্বন্ধে দৌলত কাজীর সাক্ষ্য এইরূপ :—

"কর্ণফুলী নদী পূর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ-অবতরী॥
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার।
নাম শ্রীসুধর্ম্ম রাজা ধর্ম্ম-অবতার॥
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন॥
দেবগুরু পূজএ ধর্ম্মেত তার মন।
সে পদ দর্শনে হএ পাপের মোচন॥

(১) History of Burma—Lt. Col. A. P. Phayre, p. 177.

(২) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৩, পৃষ্ঠা ৬৪।

পুণ্য ফলে দেখে যদি রাজার বদন।
নারকিহ স্বর্গ পাএ সাফল্য জীবন॥
* * *
রাজ্য সব উপসম কৈল সুবিচার।
কাকে কেহ না শঙ্কে উচিত ব্যবহার॥
মধু-বনে পিপিলিকা যদি করে কেলি।
রাজ ভয়ে মাতঙ্গ না যাএ তারে ঠেলি॥
* * *
সেই-ধর্ম্ম কীর্ত্তি যশ যে শুনে যে গাএ।
জন্ম দুঃখী হএ সুখী দারিদ্র্য পলাএ॥"

রাজার সৈন্য, সেনা, ও নৌবাহিনী অগণ্য ছিল। এ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন :—

"ধবল, অরুণ, কালা নানা বর্ণ গজ।
আকাশ ছাইআ চলে নানা বর্ণ ধ্বজ॥
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে সৈন্য অশ্ব নাহি সীমা।
কনে বা কহিতে পারে নৌকার মহিমা॥"

এহেন প্রবল পরাক্রান্ত, সুবিচারক ও ধর্ম্মাচারী বৌদ্ধ রাজার একজন "লস্কর-উজীর" অর্থাৎ "সমর-সচিব" ছিলেন মুসলমান; তাঁহার নাম আশরফ খান। এই আশরফ খাঁর আদেশেই কবি তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন। তিনি রাজার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার হস্তে সমস্ত রাজনীতি ছাড়িয়া দিয়া রাজা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। মহারাণীও তাঁহাকে পুত্র হইতে অধিক, "সুপাত্র ও সুপণ্ডিত" বলিয়া মনে করিতেন (১)। ইহা হইতে দেখা যাইবে, আরকান রাজ্যে "লস্কর-উজীর" আশরফ খাঁর কতখানি প্রভাব, প্রতাপ ও ক্ষমতা ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই রাজ্য চালাইতেন, এবং রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। সুতরাং এই রাজ্যে মুসলমানদের প্রভাব, সুখ-সুবিধাও যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইয়াছিল। আরকানে বহু শেখ, সৈয়দ, কাজী, মোল্লা, আলিম, ফকীর, আরবী, রুমী, মোগল, পাঠানের আমদানী

"মুখ্য পাত্র শ্রীযুত আশরফ খান।
হানিফী মোজাব ধরে চিস্তীর খান্দান॥
* * *
হেন রাজা যার প্রতি মহাদয়া করে।
মহামন্ত্রী লস্কর উজীর নাম ধরে॥
মহারাজ আত্মপ্রিয় জানি শুদ্ধ মন।
তান হস্তে রাজ নীতি কৈল সমর্পণ॥
মহাদেবী মনেতে ভাবিল সুনিশ্চিত।
রাজপুত্র হস্তে অধিক সুপাত্র পণ্ডিত॥
নৃপতিহ পুত্রভাব হরিষ সাদরে।
মহামাত্য করিলেন্ত আশরফ খাঁরে॥" (সতী ময়না)

হইল, এবং আশরফ খাঁ রোসাঙ্গে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা ও বাসস্থান দান করিবার ভার গ্রহণ করিলেন; নানা স্থানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পুষ্করিণী খনন করাইলেন। আচীন (=অচি) কুচীন (=কুচি), মস্‌লি-পট্টন (=মচিলিপাটন) হইতে আরম্ভ করিয়া মক্কা-মদিনা পর্য্যন্ত দেশে দেশে স্বদেশত্যাগী, প্রবাসী, পথিক ও বণিকদের মুখে তাঁহার স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম-প্রীতির খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল (১)।

"লস্কর-উজীর" আশরফ খাঁ চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। হাটহাজারী থানার চারিয়া গ্রামে তাঁহার বিরাট পাকাবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান আছে; এ গ্রামে তাঁহার একটি দীঘিও স্মৃতি বহন করিতেছে (২)। চট্টগ্রামের নানাস্থানে তাঁহার বহু কীর্ত্তিচিহ্ন আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে রাউজান থানার অন্তর্গত কদলপুর গ্রামের একটি বিশাল দীর্ঘিকাই প্রধান; ইহা এখনও "লস্কর উজীরের দীঘি" নামে খ্যাত (৩)।

এইরূপে রোসাঙ্গ-রাজসভায় যে মুসলমান-প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা লোপ পাইল না; ইহা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। তাই, আমরা দেখিতে পাই, রোসাঙ্গ-রাজ্যের উচ্চতম রাজপদগুলি মুসলমান না হইলে পূর্ণ হয় না। মুসলমানগণ রাজ্য-শাসন-ব্যাপারে সমধিক দক্ষ ছিলেন, সন্দেহ নাই। নতুবা রাজ্যের উচ্চতম রাজপদগুলি মুসলমান দ্বারা পূর্ণ হইত না।

১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রোসাঙ্গ-রাজ থিরী-থু-ধম্মা রাজা নিহত হইলেন। তাঁহার পুত্র মিন্‌সানি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মাত্র অষ্টবিংশতি দিবস রাজত্ব করার পরে, রোসাঙ্গ-সিংহাসন শূন্য হইল। পরবর্ত্তী রাজা নরপদিগ্যি (১৬৩৮—১৬৪৫ খ্রীঃ) থিরী-থু-ধম্মা রাজার মন্ত্রী ছিলেন। মিন্‌সানির পরে, রাণী এক সভা করিয়া নরপদিগ্যিকে সিংহাসন দান করিলেন।

তাঁহার সময় হইতে আরকান-রাজগণ মুসলমানী নাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত তাঁহার মুদ্রায় ফার্‌সী অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় না (৪)। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া, তাঁহার সময় হইতে রোসাঙ্গে মুসলমান-প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইল বলিয়া অনুমান করা ঠিক নহে। থিরী-থু-ধর্ম্মা রাজার রাজত্বের শেষ বৎসর হইতে অর্থাৎ ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নরপদিগ্যির রাজত্বের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ

(১) "মসজিদ পুষ্করণী দিল বহুবিধ দান।
মক্কা মদিনাতে গেল প্রতিষ্ঠা বাখান॥
সৈয়দ, কাজী, সেক, মোল্লা, আলিম, ফকীর।
পূজেন্ত সে সবে যেন আপনা শরীর॥
বৈদেশী, আরবী, রুমী, মোগল, পাঠান।
পালেন্ত সে সবে যেন শরীর সমান॥
* * *
দেশান্তরী, প্রদেশী, পন্থিক বণিজার।
দেশে দেশে কীর্ত্তি যশ বাখানে যাহার॥
উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ।
অচি, কুচি, মচিলিপাটনা আদি দেশ॥" (সতী ময়না)

(২) সাধনা, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭, পৃষ্ঠা, ৩০৩।

(৩) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ, ১৩২৫, পৃঃ, ২৮৪।

(৪) J. A. S. B., Vol, XV, 1846, p. 234

১৬৩৮—১৬৪৫ এই সাত বৎসর আরকানে রাষ্ট্রবিপ্লবের ও গৃহবিবাদের ফলে, ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আরকান-রাজের হস্তচ্যুত হয়। এই বৎসর (১৬৩৮ খ্রীঃ) চট্টগ্রামের "মঘ" শাসনকর্ত্তা মেঙরে (Mengre i. e. War-chief=সেনাপতি) মুঘল রাজ-প্রতিনিধি ইস্‌লাম খাঁর হস্তে চট্টগ্রাম সমর্পণ করিতে বাধ্য হন ; এই মেঙরে বাঙ্গালার ইতিহাসে "মুকুট রায়" নামে প্রসিদ্ধ (১)। এহেন রাজনৈতিক কারণে আরকানী মুদ্রা হইতে ফারসী ভাষা পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় (২)।

রাজা নরপদিগ্যির ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারীর নাম থদো বা থদো মিন্তার (Thado, Thado Mintar). তিনি ১৬৪৫ হইতে ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই থদো মিন্তার (অর্থাৎ "ছদো উমাদার)-এর রাজত্বকালে মহাকবি আলাওল তাঁহার সুবিখ্যাত "পদ্মাবতী" কাব্য রচনা করেন (৩)। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি রাজা থদো মিন্তারকে [=ছদো উমাদার] তাঁহার কাব্যে নরপদিগ্যির পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৪)। বোধ হয়, এ বিষয়ে তিনি প্রকৃত তথ্য অবগত ছিলেন না ; অথবা কে বলিবে, ইতিহাস থদো মিন্তারকে নরপদিগ্যির ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া ভুল করে নাই ?

সে যাহা হউক, আলাওল হইতেই আমরা জানিতে পারিতেছি(৫), থদো মিন্তারের খুল্লতাত বা পিতা নরপদিগ্যির "সমর-সচিব (সৈন্যমন্ত্রী) ছিলেন, আলাওলের সর্ব্বপ্রথম আশ্রয়দাতা ও মুসলমান(৬) মাগণ ঠাকুরের পিতা "শ্রীবড় ঠাকুর"। শ্রীবড় ঠাকুরের জীবদ্দশায় তাঁহার পুত্র মাগণ অন্য এক "পাত্রের" অর্থাৎ মন্ত্রীপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। রাজা নরপদিগ্যি মাগণ ঠাকুরকে এমনই বিশ্বাস ও স্নেহ করিতেন যে, মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যাটিকে ভবিষ্যৎ তত্ত্বাবধানের জন্য মাগণের হাতেই তুলিয়া দিলেন। এই কন্যা পরে থদো মিন্তারের মুখ্য পাটেশ্বরী হইলে, মাগণ ঠাকুরকে শৈশবের পাত্র দেখিয়া রোসাঙ্গ-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর (মুখ্যপাত্র) পদ দান করেন(৭)। এই সকল বিষয় হইতে দেখা যাইবে,

---

(১) Ibid,—pp, 234-235.

(২) Ibid,—p, 235.

(৩) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৩ বাং—পৃঃ ৬৪।

(৪) "সলিম শাহার বংশ, যদ্যপি হইল ধ্বংস
নৃপগিরি হৈল রাজাপাল।
রাজ সুখ ভোগ মূল, কি দিব তাহার তুল
রসভোগে গোঁয়াইল কাল॥
এক পুত্র এক কন্যা, সংসারেতে ধন্য ধন্যা,
জনমিল নৃপতি সম্ভব।
চলিতে ত্রিদিব স্থান, পুত্রে কৈলা রাজ্যদান,
যারে দেখি লজ্জিত বাসব॥
ছদো উমাদার নাম, রূপে গুণে অনুপাম"—ইত্যাদি (পদ্মাবতী)

(৫) উপর্য্যুক্ত "চারি' সংখ্যক উদ্ধৃত অংশের পরবর্ত্তী সুদীর্ঘ বিবরণ "পদ্মাবতী" কাব্যে লিখিত আছে। তাহা পাঠ করিলে মাগণ ও তৎপিতার বিষয় জানিতে পারা যাইবে। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।

(৬) "ঠাকুর" উপাধিধারী মাগণ ও তৎপিতা যে মুসলমান ছিলেন, সে বিষয় পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সম্যক্‌রূপে জানা যাইবে।

(৭) "বৃদ্ধ নরপতি যদি গেল স্বর্গপুরী।
সেই কন্যাবর হৈল মুখ্য পাটেশ্বরী॥
শৈশবের পাত্র দেখি বহুস্নেহ ভাবি।
মুখ্যপাত্র করিতা রাখিলা মহাদেবী॥ (পদ্মাবতী)

নরপদিগিয়ির রাজত্ব হইতে আরকানের মুদ্রায় ফারসী ভাষা বিলুপ্ত হইলেও, রোসাঙ্গে মুসলমান-প্রভাব ও প্রতিপত্তি তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল।

থদো মিন্তারের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র সান্দ-থু-ধম্মা (১৬৫২—১৬৮৪ খ্রীঃ) রাজা হইলেন। তাঁহার ন্যায় এত দীর্ঘ দিন আর কেহ রাজত্ব করেন নাই; তিনি ৩২ বৎসর যাবৎ রোসাঙ্গ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইহার কারণ, তিনি অল্প বয়সেই সিংহাসনারোহণ করেন। আলাওলের "সয়ফুল মুলুক" কাব্য হইতে জানিতে পারা যায়(১), তিনি যখন রোসাঙ্গ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখনও রাজ্য-শাসনে তাঁহার ক্ষমতা জন্মে নাই। তাই তাঁহার মাতা মাগণ ঠাকুরকে "প্রধান মন্ত্রী" (মুখ্যপাত্র) পদে উন্নীত করিয়া, নিজেই পুত্রের প্রতিনিধি (Regent) রূপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মাগণ ঠাকুরের মৃত্যুর পূর্ব্বেই সান্দ-থু-ধম্মা স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাগণ ঠাকুরের মৃত্যুর পর সোলেমান নামক একজন মুসলমান মাগণ ঠাকুরের শূন্য পদ পূর্ণ করিলেন, অর্থাৎ রোসাঙ্গ-রাজ সান্দ-থু-ধম্মার "প্রধান মন্ত্রী" (মহাপাত্র) হইলেন। দেশের রাজকোষ ও সাধারণ শাসনের ভার এই মুসলমান প্রধান-মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত ছিল(২)। এই সান্দ-থু-ধম্মার রাজত্বকালে রোসাঙ্গ-রাজ্যের সমস্ত বড় বড় রাজপদ মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত ছিল। সৈয়দ মোহাম্মদ তাঁহার "সমর-সচিব" (সৈন্য-মন্ত্রী) ছিলেন; আলাওল ইঁহারই আদেশে তাঁহার "সপ্ত পয়কর" কাব্য রচনা করেন(৩)। মজলিস নামক অন্য এক ব্যক্তি আরকান-রাজসভায় "নবরাজ" ছিলেন; ইনি "নবরাজ মজলিস" নামে পরিচিত। আলাওল ইঁহার আদেশে ফারসী কাব্য "সেকান্দর নামার" পদ্যানুবাদ করেন (৪)। এই সময়ে রোসাঙ্গে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার মুসলমান কাজীর দ্বারা সম্পাদিত হইত বলিয়া মনে হয়। এই যুগে ছুউদ শাহ্ নামক এক ব্যক্তি রোসাঙ্গের "কাজী" ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়—

(১) পরবর্ত্তী "কবি মাগন ঠাকুর" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

(২) "তার পুন. রাজ্যের হইল ভাগ্যোদয়।
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা সে নৃপ মহাশয়॥

* * *

তান মহাপাত্র শ্রীমন্ত সোলেমান।

* * *

হেম রত্ন রূপা আদি ভাণ্ডার সকল।
পাত্র হস্তে দিলা রাজা তান করতল॥
লক্ষ লক্ষ কর্ম্ম যত দেশের মাঝার।
সে সকল উপরে তাহার অধিকার॥ (সতী ময়নাতে আলাওলের রচিত অংশ

(৩) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৩ বাং, পৃঃ ৬৮। এবং—

তাহে নৃপ অনুপাম, শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা নাম,
খল নাশ দুঃখিতের গতি।

* * *

হেন মহারাজেশ্বর অখণ্ড সম্পদ।
তান মুখ্য সৈন্যমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ॥ (সপ্ত পয়কর)

(৪) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৩ বাং, পৃঃ ৬৭।

"ছৈয়দ ছউদ শাহা রোসাঙ্গের কাজী।
জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজী॥ (সেকান্দর নামা)

সৈয়দ মুসা নামে অন্য এক ব্যক্তিও সান্দ-থু-ধম্মার এক পাত্র ছিলেন। আলাওল তাঁহারই আদেশে "সয়ফুল মুলুক" কাব্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন (১)।

যেই রাজার রাজসভা মুসলমানদের দ্বারাই এইরূপে পরিচালিত হইত, সেই রাজার রাজ্যে মুসলমান-প্রাধান্য কত বেশী ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য রাজা সান্দ-থু-ধম্মাও মুসলমানদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, সন্দেহ নাই। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে শাহ শুজা তাঁহার হস্তে নির্ম্মম ও পাশবিকভাবে নিহত হইয়াছিলেন, ইহার মূলে মারাত্মক রাজনীতি বিদ্যমান ছিল। ইহা দ্বারা রাজার মুস্‌লিম-প্রীতির লাঘব প্রমাণিত হয় না। এই জন্যই দেখিতে পাই,

"নানা দেশী নানা লোক, শুনিআ রোসাঙ্গ ভোগ
আইসন্ত নৃপ ছায়াতল।
আরবী, মিছিরী, সামী, তুরুকী, হাবসী, রুমী
খোরাছানী উজবেগী সকল॥
লাহুরী, মুলতানী, সিন্ধি, কাশ্মিরী, দক্ষিণী, হিন্দী,
কামরূপী আর বঙ্গদেশী।
অহপাই খোটনচারী (?), কর্ণালী, মলয়াবারী,
আচি, কুচি (২) কর্ণাটক বাসী॥
বহু সেখ, ছৈআদজাদা, মোগল পাঠান, যোদ্ধা,
রাজপুত্র, হিন্দু নানা জাতি।
আভাঈ, বরমা, শ্যাম, ত্রিপুরা, কুকীর নাম
কতেক কহিমু ভাতি ভাতি॥
আরমানী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইঙ্গরাজ,
কাস্তিলান আর ফরাস্সিস্।
হিস্পাণী, আল্‌মানী, ছোল্দার, নছরাণী,
নানা জাতি আছে পুর্ত্তকিস্॥" (পদ্মাবতী)

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে উপর্য্যুক্ত প্রকার মুস্‌লিম্-প্রভাবে ভরপূর রোসাঙ্গ-রাজসভায় মুসলমান কবিদেরই হাতে বাঙ্গালা সাহিত্য পরিপুষ্ট হইতেছিল। রোসাঙ্গ-রাজসভার এহেন বঙ্গ-সাহিত্য-প্রীতির ফল বহুমুখী ও দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। সে কথা ধীরে ধীরে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

(১) প্রাগুক্ত।
(২) আচি, কুচি—আচীন ও কোচীন দেশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোসাঙ্গ্‌-রাজসভা-কবি

প্রথম প্রসঙ্গ ঃ—

দৌলত কাজী বা কাজী দৌলত

সুদূর আরকানে বিজাতীয় ও ভিন্ন ভাষা-ভাষী রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়া বঙ্গ-ভারতীর যে সকল সুসন্তান খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কাব্যোদ্যান রচনা করিতেছিলেন, কবি দৌলত কাজী তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বঙ্গীয় কবি আরকান-রাজসভায় বাস করিয়া কাব্য-লক্ষ্মীর সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন কিনা, তাহা এ পর্য্যন্ত আমরা জানিতে পারি নাই। বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠে পরাইয়া দিবার জন্য, বাঙ্গালার এই প্রাচীন কবি পরানুগ্রহ-ছায়াতলে বসিয়া, ধীরে ধীরে যে বিচিত্র ও সুরম্য মালা গাঁথিতেছিলেন, নিষ্ঠুর কাল-চক্ষে তাহা সহ্য হয় নাই। হাতের মালা অসমাপ্ত রাখিয়া, কবি যেদিন অকালে মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন, সেদিন বঙ্গ-ভারতীর পক্ষে কি করুণ ও দুর্ভাগ্যের দিন ছিল, তাহা কে বলিবে! পরবর্ত্তীকালে তাঁহার অসমাপ্ত মাল্য সমাপ্ত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু মালাকারের পরিবর্ত্তনে মাল্য-রচনার শিল্পে যে অদ্ভুত বৈষম্য দেখা দিয়াছিল, তাহাতে বঙ্গ-ভারতীর কণ্ঠের শোভার সত্যই কিঞ্চিৎ লাঘব ঘটে।

ভূমিকা

সে যাহা হউক, কবি দৌলত কাজী চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (১)। স্থানীয় প্রাচীন লোকদের নিকট হইতে জানিতে পারা যায়, কবি অল্প বয়সেই নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলে তখন তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত একটিও ছিল না; কিন্তু তিনি তরুণ বয়স্ক ছিলেন বলিয়া ঐ অঞ্চলের বৃদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহার পাণ্ডিত্য স্বীকার করিতেন না। এই জন্য দেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি না হওয়ায়, তিনি মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া সুদূর আরকানে গমন করেন। আরকান-রাজসভায় তখন বহু পণ্ডিত বাস করিতেন। একদা রাজসভায় পণ্ডিতদের মধ্যে কোন কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে ভীষণ তর্ক বাধিয়া যায়। ঐ সভায় কবি দৌলত কাজীও উপস্থিত ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্কের কোন সুমীমাংসা না হওয়ায়, কবি কাজী দৌলত সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। পণ্ডিতগণ তরুণ বয়স্ক কবির উক্তিকে মূর্খ বালকের ধৃষ্টতা বলিয়া উপহাস করিলেও, রাজমন্ত্রী কবিকে ঐ বিষয়ে তাঁহার মত প্রকাশ করিতে আদেশ দেন।

কবির জন্মস্থান ও প্রাথমিক জীবন।

(১) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ ১৩৩৫ বাং—পৃঃ ২৮৪।

কবি কাজী দৌলত সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অতি সুন্দরভাবে সমস্যাটির সমাধান করিয়া সভাস্থ সকলকে তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ করেন। বলা বাহুল্য, ইহার পর কবি দৌলত কাজীও আরকান-রাজসভা-পণ্ডিতদলে প্রবেশ করিলেন। এই সময়েই তিনি তাঁহার "সতী ময়না" নামক প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করেন। তাঁহার এই কাব্য সমাপ্ত না হইতেই, তিনি অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন; তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না।

কবি সম্বন্ধে এই প্রবাদ অসত্য বলিয়া মনে হয় না। তিনি কিরূপে আরকান-রাজসভায় প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন, এ বিষয়ে তাঁহার কাব্য হইতে বিশেষ কিছু জানিতে না পারিলেও, অস্পষ্টভাবে তাঁহার কাব্যে যে উক্তি দেখিতে পাই, তাহা হইতে জানিতে পারি, আরকান রাজার প্রধান অমাত্য আশরফ খান সভা করিয়া কাব্যালোচনা করিতেন; একদা এহেন কোন সভায় নানা কাব্য ও শাস্ত্রালোচনা প্রসঙ্গে আশরফ খান "সাধন" নামক কোন কবির ঠেঠ্ হিন্দী ভাষায় বিরচিত, চৌপদী ও দোহার ছন্দে লিখিত "সতী ময়না" প্রসঙ্গ শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কবি কাজী দৌলত তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন (১)। আমাদের মনে হয়, এইরূপ কোন সাহিত্য-সভায় কবি কাজী দৌলত আপন পাণ্ডিত্য দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

আরকানের রাজ-সভায় কবির প্রতিষ্ঠা।

উপর্যুক্ত প্রবাদ হইতে আমরা আরও জানিতে পারিতেছি, কবি অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেন। খুব সম্ভব, এই জন্যই কবি এক অসমাপ্ত "সতী ময়না" ব্যতীত আর কোন কাব্য লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার কোন বংশধরও এখন আর নাই। আমরা সোলতানপুরে তাঁহার পৈতৃক বাস্তু-ভিটা দেখিয়াছি। "তাঁহার ভিটায় এখন বাতি দিবার কেহ নাই"(২)। সম্ভবতঃ কবি নিঃসন্তান ছিলেন।

কবি দৌলত সম্ভ্রান্ত "কাজী" বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের প্রত্যেক ভণিতায়

(১) "শ্রীযুক্ত আশরফ অমাত্য প্রধান।
ষোলকলা পূর্ণ যেন চন্দ্রিমা সমান॥
নীতিবিদ্যা, কাব্যশাস্ত্রে নানা রসচয়।
পড়িলা শুনিলা নিত্য সানন্দ হৃদয়॥
হেনকালে সভা করি বসিয়া থাকিতে।
কহেন্ত সানন্দ চিত্ত প্রসঙ্গ শুনিতে॥
আরবী ফার্ছি নানা তত্ত্ব উপদেশ।
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ॥
গুজরাতী, গোহারী, ঠেঠ ভাষা বহুতর।
সহজে মহৎ সভা আনন্দ নিয়র॥
শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি।
শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী॥
* * *
ঠেঠা চৌপাইয়া দোহা কহিল সাধন।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জন॥
দেশী ভাষে কহ তাক পঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝএ আনন্দে॥
তবে কাজী দৌলত বুঝি সে আরতি।
পঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী॥"
সতী ময়না।

(২) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন,—অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ,—চট্টগ্রাম অধিবেশন।

তাঁহার বংশগত উপাধি "কাজী" কথাটি দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার জন্ম হয়; কেননা তিনি রোসাঙ্গ-রাজ শ্রীসুধর্ম্মার (Thiri-thu-dhamma = থিরি-থু-ধম্মা) আমলে অর্থাৎ ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তদীয় "লস্কর উজীর" অর্থাৎ "সমর-সচিব" আশরফ খাঁর আদেশে তাঁহার অসমাপ্ত কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন(১)। কবি তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভে এই আরকান-রাজ শ্রীসুধর্ম্মা (১৬২১ – ১৬৩৮ খ্রীঃ) ও তাঁহার সমর-সচিব আশরফ খাঁর প্রশংসা-কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ(২)। আমরা দেখিয়াছি কবি অল্প বয়সেই মারা যান; "সতী ময়না" রচনাকালে কবির বয়স ৩৮ বৎসরের অধিক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কবি কাজী দৌলত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রথম ভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। কবির জীবন সম্বন্ধে ইত্যধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কবি তাঁহার কাব্যে রোসাঙ্গ-রাজ ও তাঁহার সমর-সচিব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই।

কবির জন্ম ও মৃত্যু।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, "সতী ময়না"র পরিসমাপ্তি ঘটিবার পূর্ব্বে কবি দৌলত কাজী অমর-ধামে প্রস্থান করেন। তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক একবিংশতি বর্ষ পরে অর্থাৎ ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরবর্ত্তী কবি আলাওল রোসাঙ্গ-রাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার (Thiri-Sanda-Thudhamma, 1652-1684 A.D) প্রধান অমাত্য সোলেমানের আদেশে দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্যখানি সমাপ্ত করিয়াছিলেন(৩)। দৌলত কাজী তাঁহার

কবির অসমাপ্ত কাব্যের পরিসমাপ্তি।

(১) সাধনা, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৭ বাং—পৃষ্ঠা ৮৫।
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১১ বাং ২য় সংখ্যা—পৃঃ ৬৪।

(২) "কর্ণফুলী নদী পূর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী॥
তাহাতে মগধবংশ ক্রমে বুদ্ধাচার।
নাম শ্রীসুধর্ম্মা রাজা ধর্ম্ম অবতার॥
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন॥
পুণ্যফলে দেখে যদি রাজার বদন।
নারকিহ স্বর্গ পাএ সাফল্য জীবন॥
* * *
মুখ্যপাত্র শ্রীযুক্ত আশরফ খান।
হানাফী মোজহাব ধরে চিস্তিয়া খান্দান॥
* * *
হেন রাজা যার প্রতি মহাদয়া করে।
মহামন্ত্রী লস্কর উজির নাম ধরে॥
* * *
শ্রীআশরফ খান লস্কর উজীর।
যাহার প্রতাপ-বজ্রে চূর্ণ অরি শীর॥ (সতী ময়না)

(৩) আলাওল কর্ত্তৃক "সতী ময়নার" সমাপ্তির তারিখ এইরূপ:—
"মুসলমানী সক সংখ্যা শুন দিআ মন।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন॥

কাব্যের শেষ খণ্ড পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন। এই শেষখণ্ডে তিনি ময়নাবতী ও দুতীর উত্তর প্রত্যুত্তরচ্ছলে, "বারমাসী" আরম্ভ করিয়া একাদশ মাস পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিয়াছিলেন(১)। আলাওল দ্বাদশ মাস সমাপ্ত করিয়া লোরের সহিত চন্দ্রাণীর মিলন ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে আলাওল কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সে কথা পরে বলিব।

দৌলত কাজীর "সতী ময়না" কাব্যখানি মোট তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে কাব্যের প্রধান প্রধান নায়ক-নায়িকার প্রথম বিবাহিত জীবনের ঘটনাবলী এবং তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবনের নিস্ফলতা ও অতৃপ্তির

কাব্যের খণ্ড

পূর্ণ আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই খণ্ডকে কাব্যখানির "পরিচয় খণ্ড" বলিয়া নাম দেওয়া যাইতে পারে; কেননা এই খণ্ডে আমরা কাব্যের প্রত্যেক চরিত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া উঠি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চরিত্রগত দোষ-গুণগুলির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে কাব্যের প্রধান নায়িকা ময়নাবতীকে কবি বিরহানলে বিদগ্ধ করিয়া শোধিত স্বর্ণে পরিণত করিয়াছেন। এই খণ্ডেই কবির কবিত্ব-সুধা ময়নাবতীর বিরহ ও তাঁহার প্রতি ছাতনের সহস্র প্রলোভনকে উপলক্ষ্য করিয়া সুপ্রসিদ্ধ "বারমাসী"র আকারে মন্দাকিনী ধারার ন্যায় শতধারে উৎসারিত হইয়াছে। এই খণ্ডকে অনায়াসেই "বিরহ খণ্ড" বলিয়া নাম দেওয়া যাইতে পারে। তৃতীয় বা শেষখণ্ডে ময়নাবতীর সহিত তাঁহার স্বামী লোর ও সপত্নী চন্দ্রাণীর মিলন ঘটে।

সিন্ধু শূন্য দেখিআ আপনা দুই দিগে।
সুত কলানিধিরে রাখিলা বাম ভাগে॥
মগদের সনের শুনহ বিবরণ।
যুগ শূন্য মধ্যে যুগ বামে মৃগাঙ্কন॥" (সতী-ময়না)

অর্থাৎ আলাওল এই কাব্যখানি যথাক্রমে ১০৭০ হিজরী (= ১৬৫৯ খ্রীঃ) ও ১০২০ মঘীতে (১০২০ + ৬৩৮ = ১৬৫৮ খ্রীঃ) সমাপ্ত করিয়াছিলেন। দৌলত কাজী শ্রীসুধর্ম্মা রাজার রাজত্বের (১৬২২—১৬৩৮ খ্রীঃ) শেষ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিলেও, দেখা যায়, দৌলত কাজীর মৃত্যুর ২১ বৎসর (১৬৫৯—১৬৩৮ = ২১) পরে তাঁহার অসমাপ্ত কাব্য আলাওল কর্তৃক সমাপ্ত হইয়াছিল।

(১) "আশরফ আজ্ঞাএ দৌলত কাজী ধীর।
রচিল চন্দ্রাণী কথা অতি সুরুচির॥
শেষ খণ্ডে ময়নার কথা করিল প্রকাশ।
দুতীর সংবাদ পদুত্তর বারমাস॥
সুচারু পয়ার মিলে নানা ছন্দগীত।
একাদশ মাস সাঙ্গ হৈল বিরচিত॥

* * *

তবে কাজী দৌলত স্বর্গেত হৈলা লীন।
খণ্ড বাক্য পুস্তক আছিল চিরদিন॥
যেন মতে ময়না কৈল দুতীর দুর্গতি।
পুনরপি আসিয়া মিলিল লোরপতি॥
এ সকল শেষ কথা অসাঙ্গ রহিল।
সুধর্ম্মার শেষে তিন নৃপ চলি গেল॥

দৌলত কাজী প্রথম খণ্ডের শেষে তাঁহার কাব্যের মিলনান্ত পরিসমাপ্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন (১)। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দ্বিতীয় খণ্ডের "বারমাসী"র একাদশ মাস (আষাঢ় হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাস) পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিয়া কবি মহাপ্রয়াণ করিলে, কবির ইঙ্গিতমত মিলনান্ত করিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী কবি আলাওল তাঁহার অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই তৃতীয় খণ্ডকে "মিলন খণ্ড" বলিয়া অভিহিত করা যায়।

এই কাব্যের উপাখ্যানভাগ তেমন চমকপ্রদ নহে। সাধারণ প্রাচীন কাব্যগুলির ন্যায় নায়ক-নায়িকার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নানা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশে এই কাব্য লিখিত নহে।

কাব্যে নূতন আদর্শ।

নায়ক-নায়িকাদের দাম্পত্য-জীবনের একটিমাত্র অংশই এই কাব্যের বর্ণিত বিষয়। এত অল্প পরিসরের মধ্যে কাব্যের চরিত্রগুলি যেমন চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শুধু যে তেমনটি বাঙ্গালার আর কোন প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না তেমন নহে, বরং ইহাতে চিরাচরিত প্রাচীন কাব্যরীতি পরিত্যক্ত হইয়া নূতন কাব্যাদর্শের পত্তন করা হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যাদর্শ-পরিবর্ত্তনে এমন অসম সাহসের কার্য্য, কবি দৌলত কাজীর পূর্ব্বে আর কোন বঙ্গীয় কবি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। এহেন নূতন আদর্শ-প্রণোদিত হইয়া কবি তাঁহার কাব্যের পরিসর নিতান্তই ক্ষুদ্র করিয়া লইলেও, ইহাতে উজ্জ্বল চরিত্র-চিত্রণের কলাকৌশল মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাই, তাঁহার অমর তুলিকার যাদুস্পর্শে ময়নাবতীর সতীত্ব, লোরের যৌবন-চাঞ্চল্য ও কামনা, চন্দ্রাণীর নটিপনা ও অসংযম, ছাতনের লাম্পট্য, রত্না-মালিনীর ধূর্ত্ততা ও চাতুর্য্য, ছোট ছোট ঘটনা-প্রবাহে এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই চরিত্রগুলি কিভাবে কাব্যে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ :—

কাব্য-বর্ণিত চরিত্রমালা ও উপাখ্যান।

নবযৌবনা অপূর্ব্বসুন্দরী রাজকুমারী ময়নাবতীর সহিত লোর নামক কোন রাজকুমারের বিবাহ হয়। বিবাহের পর কিছুদিন বেশ সুখ-সম্ভোগে কাটিয়া যায়। এই সময়ে পরস্পর পরস্পরের প্রেমে এমনই আসক্ত ছিল যে "তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে দোহান আকুল" হইত। কিন্তু এমন অবস্থা বেশী দিন রহিল না; লোরের অন্তর্নিহিত চরিত্রে অসংযম প্রবল হইয়া উঠিল; ময়নাবতীতে আর তাঁহার মন মজিয়া রহিল না; কেন না—

"যুবক পুরুষ জাতি নিঠুর দুরান্ত।
এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত॥"

---

(১) "চন্দ্রাণীর দেশে যদি গেলা লোরপতি।
কোন কর্ম্ম করিলা এথাতে ময়নাবতী॥
ময়নাবতী রাজ্যে লোরেন্দ্র আইল পুনি।
তবে কোন্ উপাএ করিলেক চন্দ্ররাণী॥
কোন মতে এভিন মিলিএ তার সঙ্গ।
কোন মতে ময়না সঙ্গে ছাতন প্রসঙ্গ॥
কোন মতে আছিল বিরহ মনভঙ্গ।
কাজী দৌলতে রচে সে সব প্রসঙ্গ॥"

প্রথম খণ্ডের পরিসমাপ্তি—সতী ময়না।

মধুকরের ন্যায় পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু আহরণ করিয়া বেড়াইবার জন্য লোরের ইচ্ছা হইল। তিনি ময়নাবতী হইতে মন উঠাইয়া লইয়া নট-নটীপরিবৃত হইয়া কিছুদিন কুঞ্জে সম্ভোগ সুখে দিন কাটাইতে চলিয়া গেলেন। রাজ্যপাট বিরহিণী ময়নাবতীর হস্তে সমর্পিত হইল। লোর কুঞ্জবনে নৃত্য-গীতে সংসার ভুলিয়া আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলেন।

এই সময়ে, পশ্চিমের গোহারী দেশের মোহরা নামক রাজার চন্দ্রাণী নাম্নী একমাত্র সুন্দরী যুবতী কন্যার সহিত বামন নামক এক বীরপুরুষের পরিণয় হয়। বৃদ্ধ রাজা জামাতার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন! কিন্তু এই পরিণয়ে হতভাগিনী চন্দ্রাণীর দুঃখের অবধি রহিল না; কেননা—

"দুর্জ্জয় বামন বীর বিখ্যাত ভুবন।
সমর ভূমিতে যেন সিংহের গমন॥
খর্ব্বরূপ হৈয়া বীর দীর্ঘ করে নাশ।
বামন বিক্রম যেন বলির উদাস॥
সর্ব্বগুণে যৌবন সম্পূর্ণ বীর্য্যবল।
রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল॥
* * *
মহাবীর বামন সৃজিলা প্রজাপতি।
নারী সঙ্গে রতিরস হীন মূঢ়মতি॥"

এহেন নপুংসক স্বামী লাভ করিয়া চন্দ্রাণীর মানসিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কি করিবেন; অনন্যোপায় হইয়া তিনি "সময় গোঁআন্ত নানা কাব্য রস কেলি" করিয়া। এইরূপে আর বেশী দিন চলিল না

"একাকিনী নারী দেখি দুরন্ত বসন্ত।
পুষ্পশর লৈয়া করে লাঘব অনন্ত॥
* * *
শীতল মন্দিরে কন্যা নাহি রহে স্থির।
মদন বেদনা চিত্তে আঁখি ঝরে নীর॥
হিততত্ত্ব উপদেশ না শুনে শ্রবণে।
ক্ষণে আলাপএ ক্ষণেবিলাপে আপনে॥"

দুর্দ্দান্ত বসন্ত-সমাগমে চন্দ্রাণীর অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠিল। তিনি কয়েকবার স্বামীকে তাঁহার পাশে লাভ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি প্রত্যেক বারেই নপুংসক স্বামীর প্রাণে প্রেম জাগাইতে গিয়া ব্যর্থকাম হইলেন; তাই কঠোর প্রতিজ্ঞায় হৃদয় বাঁধিয়া স্থির করিলেন,—

"এমত না হয় যদি স্বামী ব্যবহার।
সহজে করিব শঠে শঠ সমাচার॥
ভালে ভাল সমযুক্ত মন্দে মন্দ যথা।
বিদ্বানেতে বিদ্যা কহি মূর্খেতে মূর্খতা॥

নারীপ্রেম বশ করে রসিকের রস।
যাহার যেমত ভাব করিব বিশেষ ॥"

ইহার পর চন্দ্রাণী তাঁহার নপুংসক স্বামী বামনকে একরূপ ত্যাগ করিলেন, রাজা কুমারীর জন্য এক সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে তথায় ব্রতচারিণীর বেশে দেব-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া দিনযাপন করিতে উপদেশ দিলেন। চন্দ্রাণী পিতার উপদেশ অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু পারিয়া উঠিলেন না ; কেননা—

"যৌবন কালেতে কন্যা বড় চিন্তা পাএ।
অনঙ্গ-ভুজঙ্গ-বিষ সর্ব্বাঙ্গে বেড়াএ।"

অনঙ্গ-ভুজঙ্গ-দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে চন্দ্রাণী প্রাসাদে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অতৃপ্ত কামনার তৃপ্তিসাধন-মানসে সুযোগের প্রতীক্ষায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

রাজকুমারী চন্দ্রাণী বৎসরে দুইবার প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া নগর পরিভ্রমণ করিতেন। এই সময়ে রাজপুরীতে সভা ও উৎসব হইত এবং এই সভায় নানা দিগেদশ হইতে রাজপুত্রগণ আগমন করিতেন। এই সুযোগে অনেকেই চন্দ্রাণীকে দেখিতে পাইত। এই সময়ে এক যোগী চন্দ্রাণীকে দর্শন করিয়াছিলেন।

একদা লোর-রাজ যখন কুঞ্জবনে আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিলেন, তখন ঐ যোগী লোরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেন। যোগী লোরের সম্মুখে নীত হইলে, "নৃপতি চরিত্র যোগী কৈল্য অবধান," এবং দেখিলেন যে, রাজা—

"মানসের গুপ্ত প্রেম ভাবে ব্যক্ত করে।
সুবর্ণ বরিখে যেন দরিদ্রের ঘরে ॥"

রাজার চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ব্যর্থযৌবনা চন্দ্রাণীর কথা যোগীর মনে হইল। তিনি রাজাকে চন্দ্রাণীর যাবতীয় সংবাদ দান করিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন,—

"পুরুষের মধ্যে তুমি রূপে সুরপতি।
স্ত্রীর মধ্যে চন্দ্রাণী শচী কলাবতী ॥
চন্দ্রাণীর তোমার মিলন মনোরম।
বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম ॥" (১)

যোগীর মুখে লোর-রাজ চন্দ্রাণীর কথা শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন,

"রাজ্যে মোর কার্য্য নাই হৈমু দেশান্তরী।
সর্ব্বদা যাইমু যথা চন্দ্রাণী গোহারী ॥"

অতঃপর যোগীকে সঙ্গে লইয়া লোর গোহারী-রাজ্যে চন্দ্রাণীকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন এবং

(১) ভারতচন্দ্রের (১৭১২—১৭৬০ খ্রী:) বহু পূর্ব্বে "বিদ্যাসুন্দরের" উপাখ্যান দেশে প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দৌলত কাজী উপমাচ্ছলে তাঁহার কাব্যের দুই স্থানে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যত্র তাহার উল্লেখ এইরূপ :—

'বিদ্যার সম্পাসে যেন বসিল সুন্দর।'

বৎসরান্তে গোহারী-রাজপুরীতে আমন্ত্রিত হইয়া সভায় যোগদান করিলেন। প্রাসাদ-গবাক্ষ হইতে সমাগত রাজরাজড়াদের মধ্যে লোরকে দেখিতে পাইয়া চন্দ্রাণী মুগ্ধা ও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সভা ভঙ্গ হইল; লোর বিফল মনোরথ হইয়া নিজ আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। সভাভঙ্গের পরে চন্দ্রাণী সংজ্ঞালাভ করিলে তিনি সখীগণকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। আবার সভা আহূত হইল। এইবার চন্দ্রাণীকে দেখিয়া লোর মূর্চ্ছিত হইলেন; আবার সভা ভঙ্গ হইল।

এই ঘটনার পরে লোর যোগীর বেশ ধারণ করিয়া চন্দ্রাণী যে মন্দিরে দেব-সেবা করিতেন সেই মন্দিরে গিয়া চন্দ্রাণীর সহিত মিলিত হয়েন। এই মন্দিরে চন্দ্রাণী নিজের গলার মালা ছিঁড়িয়া লোরের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে স্বামীরূপে বরণ করেন। এইরূপে সমাজ-চক্ষুর অন্তরালে, পিতামাতা ও নপুংসক স্বামীর অগোচরে ও অজ্ঞাতসারে মালা বদল হইয়া গেল; উভয়ে উভয়কে লাভ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখনও তাঁহাদের অবাধ-মিলনে যথেষ্ট বাধা বিদ্যমান ছিল। এদিকে প্রেমোন্মত্ত হইয়া চন্দ্রাণীর প্রাসাদে—

"দড়ির সোপান লই বথের উপর।
নিশাভাগে যায় লোর যেন নিশাচর॥
* * *
দেওয়ালের চারি পাশে ফিরে রাজ লোর।
চন্দ্রের উদ্দেশে যেন ভ্রমএ চকোর॥
দ্বারে দ্বারে দ্বারী জাগে হুঙ্কারে হুঙ্কারে।
কার শক্তি তদ্বারেতে দ্বার করিবারে॥
তবে লোর ভাবি চিন্তি দড়ির বড়শী।
ক্ষেপিলেন্ত কুমারীর মন্দির উদ্দেশি॥"

এইরূপে দড়ির বড়শী ক্ষেপিয়া দড়ি বাহিয়া লোর চন্দ্রাণীর শয়ন-মন্দিরে প্রতিরাত্রে নিশাচরের ন্যায় প্রবেশ করিয়া চন্দ্রাণীর সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। কিছুদিন নিরাপদে অতীত হইল। একদা চন্দ্রাণী শুনিতে পাইলেন যে, পরদিন বামন তাঁহার নিকট আগমন করিবেন। চন্দ্রাণী ভয় পাইয়া লোরকে ইহার প্রতিকার করিতে অনুরোধ করেন। পরামর্শের পর ঠিক হইল যে,

"সেই ভাল তুমি আমি যাই দেশান্তর।
এড়াইমু বামন ক্রোধ কলঙ্ক দুষ্কর॥"

অনন্তর লোর সহ চন্দ্রাণী পলায়ন করিলেন। গোহারী-রাজ কন্যার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বামন চরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া গেলেন এবং চন্দ্রাণীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন, যথাসময়ে বামনের সহিত এক অঘোর অরণ্যে পলাতক লোরের দেখা হইল। বামন সরোষে বলিলেন—

"শুনরে অধর্ম্মী মূঢ় অবোধ দুর্ম্মতি।
পর নারী হরে যেই মরণ দুর্গতি॥
* * *
তুমি কোন্ তৃণ ছার পতঙ্গ নির্ব্বলী।
বীরের রমণী লৈয়া তোহোর ধামলী॥"

লোরও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন ঃ

"গিরি সম নিজ দোষ না দেখ আপন।
রেণু সম পর পাপ শত মুখে গণ॥
খর্ব্ব কাপুরুষ যেই নপুংসক ক্রিয়া।
পুরুষ উত্তম স্থানে ত্যজে তার প্রিয়া॥
পুরুষ ভ্রমরা জান মধু যথা পাএ।
সুগন্ধি কুসুম নারী রসেতে খেলাএ॥
* * *
আমারে বলসি চোর না করি বিচার।
ভার্য্যা না ইচ্ছএ স্বামী কপাল তোমার।"

এহেন বাদানুবাদের পর, উভয় বীরে দ্বৈরথ যুদ্ধ হইল। বামন লোরের হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলেন। বনে সর্পদষ্ট হইয়া চন্দ্রাণী অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। এক মুনি তাঁহাকে বনৌষধি দিয়া বাঁচাইলেন। বৃদ্ধ গোহারী-রাজ এই সকল বিষয় শুনিয়া লোর ও চন্দ্রাণীর নিকট গমন করিলেন, এবং লোরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"কুলের চন্দ্রিমা মোর কুমারী চন্দ্রাণ।
সেই ভাল হৈল হৈছে তোমার রমণী॥"

গোহারী-রাজ নবদম্পতিকে আপন রাজ্যে লইয়া আসিলেন, এবং লোরের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া "আপনে রহিলা বৃদ্ধ রাজ গুরু বেশ!" এইখানেই কাব্যের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে ময়নার চরিত্রকে দেবীতুল্য করিয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। লোর-রাজ চন্দ্রাণীকে লইয়া গোহারী-রাজ্যে সম্ভোগ-সুখে প্রমত্ত; নিজ পত্নী ময়নাবতী ও আপন রাজ্যপালনের কথা তাঁহার মনে নাই। ময়নাবতী স্বামীর ও সপত্নীর সকল সংবাদ অবগত হইয়াছেন; কিন্তু সপত্নীর স্বৈরাচার ও স্বামীর অবিশ্বস্ততার জন্য তাঁহার হৃদয়ে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হইল না, স্বামীর প্রতি তাঁহার প্রেমের একবিন্দুও টলিল না। তিনি

"ত্যজিয়া ভূষণ হার, অঞ্জন চন্দন আর,
উপভোগ-সুখ-পরিহাস",—

নিস্পৃহ-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং ব্রতচারিণীর বেশে রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি ও প্রজার সর্ব্ববিধ কল্যাণ-বিধানে আত্মনিয়োগ করিলেন, আর নির্জ্জনে শঙ্কর-গৌরীর আরাধনা করিয়া "সর্ব্বহিত স্বামীর কল্যাণ" কামনা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এত করিয়াও ময়নাবতী নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না! তাঁহার রাজ্যের নিকটবর্ত্তী নরেন্দ্র নামক কোন নৃপতির লম্পট কুমার ছাতন শুনিয়াছিলেন,—

"কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ।
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ॥
কাঞ্চন-কমল-মুখ পূর্ণ শশী নিন্দে।
অপমানে জলেত প্রবেশে অরবিন্দে॥

চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে।
মৃগাঙ্ক-শরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে॥
মদন-মঞ্জরী ভুরু কিবা শরাসন।
লুকি গেল পুষ্পধনু লজ্জার কারণ॥
পুষ্পশর জিনি নাসা শোভে দিব্যমান॥
লজ্জাএ রহেন্ত লুকি যত কামবাণ॥
অধর বান্ধুলি রুচি কত মধু ভাষে।
সুকুন্দ-দশন-পাঁতি মুকুতা প্রকাশে॥
ঘনচয় রুচি কেশ শিরেত শোভন।
প্রভা ছাড়ি ভানু যেন তিমির শরণ॥
সুবর্ণ কর্ণিকা কর্ণে মাণিক্য নেপুরে।
দোসর অরুণ দোলে চন্দ্রিমার ক্রোড়ে॥

নির্ম্মল রাতুল অঙ্গ কেতকী সমান।
ভরমে ভ্রমর পাঁতি ধরএ জোগান।"

এহেন সুন্দরী ময়নাবতী বহুদিন হইতে স্বামীহীন অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন বলিয়া শুনিতে পাইয়া, তাঁহাকে সতীত্বের পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য রত্তনা নামক এক ধূর্ত্ত কুলটা মালিনীকে লম্পটপ্রবর ছাতন ময়নাবতীর নিকট প্রেরণ করিলেন। রত্তনা মালিনী যথারীতি সাজসজ্জা করিয়া, "সুগন্ধি তাম্বুল ডালা, চম্পক চৌছড়া মালা ভেট দিয়া" নিজের দুঃখের কাহিনী ময়নাবতীর নিকট বিবৃত করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিবার জন্য নিবেদন করিল,—

"তোমার জনক বরে, ধাত্রি করি দিল মোরে
শিশুকালে দুগ্ধ দিলুঁ তোরে।"

রত্তনা মালিনীর এহেন প্রাচীন দুঃখের কাহিনী দয়ার্দ্র-হৃদয়া ময়নাবতীর প্রাণে করুণার সঞ্চার করিল। তিনি মালিনীকে প্রকৃতই শৈশবের ধাত্রী বলিয়া মনে করিয়া সাদর-সম্ভাষণ ও মধুর ব্যবহারে আপ্যায়িত করিলেন। এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া, মালিনী ময়নাবতীর প্রতি কপট সমবেদনা-প্রকাশচ্ছলে ছাতনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল,—

"মলিন চিকুর তোর মলিন অম্বর।
মলিন দেখিএ তোর চারু কলেবর॥
নয়নে অঞ্জন নাহি সীসেত সিন্দুর।
ত্রিভঙ্গ খোপার লাস না দেখি তোহোর॥
অঙ্গেত চন্দন নাহি বদন ধূসর॥
তাম্বুল বিহনে দেখি নিরস অধর॥
কোন দুঃখে সুখভোগ ত্যজ ময়নাবতী।
আজুহ জনক তোর আছে ছত্রপতি॥"

মালিনীর এহেন কপট সমবেদনায় ময়নাবতীর হৃদয়ে সুখভোগের স্পৃহা জাগিল না, কামনার বহ্নি তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল না, পাপের কথা তাঁহার মনে হইল, জাতিকুল বিনাশের ভয়ে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কলঙ্কের অপমান, ক্ষণিক ভোগ ও মোহের পরিণাম চিত্রবৎ তাঁহার মানস-পটে জাগরিত হইল; তিনি দেবীর ন্যায় স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া মালিনীকে কহিলেন,—

"এক তিল সুখ লাগি জন্মান্তরে পাপ।
তেকারণে কে বিনাশে জাতিকুল আপ।

* * *

এক এক করি মুঞি দিমু নিজ প্রাণ।
জগতে দোসর নাম না লইমু আন॥
ফাটউক সে নারীর হৃদয় দারুণ!
এক ছাড়ি ভাবএ যে দোসরক গুণ॥
মোহর ভ্রমরা স্বামী জগৎ পূজিত।
গোময়ের কীট কোথা ভ্রমরা তুলিত॥"

মালিনী অনিচ্ছা সত্ত্বেও ময়নাবতীর কথা শুনিতে লাগিল। রাজকুমারীর অলৌকিক সতীত্বপনায় আশ্চর্য্য হইয়া সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল,

"ধনে তুষ্ট করিতে না পারি রাজসুতা।
বচনে না হয় বশ লোরের বনিতা॥"

তবে উপায় কি? ছাতনের সঙ্গে ময়নার মিলন ঘটাইবার পন্থা কোথায়? এহেন সতীকে কিরূপে বশ করিব? এবং কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া, "কোন্ ছলে করিমু ময়নার সত্যভঙ্গ?" এইরূপে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সে আবার ময়নার প্রতি বাক্যবাণ সন্ধান করিল। সে বলিতে লাগিল, ওহে ময়না ভাবিয়া দেখ,—

জীবন যৌবন রূপ চলএ নিমেষে।
নারী বৃদ্ধ হৈলে তারে না পুছে পুরুষে॥
যৌবন চলিয়া গেলে বিফল জীবন।
সংসারে না রৌক যার নাহিক যৌবন॥
দুর্লভ যৌবন জান লোকের কুশল।
যদি গেল কুশল কোথাতে কুতুহল॥
ধন নষ্ট হৈলে পুনি উপার্জ্জনে পাএ।
অগ্নি শেষ হৈলে পুনি পাথরে জন্মাএ॥
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেলে পুনি উগী যাএ।
যৌবন চলিয়া গেলে পলটি না পাএ॥
কৃপণের ধন যেন মূর্খের যৌবন।
কালে না খাইলে শেষে শোকের ভাজন॥"

ময়নাবতী নীরবে মালিনীর কথা শুনিয়া যাইতে লাগিলেন; তিনি তাহাকে আর কোন উত্তর দিতেছিলেন না। ময়নার এ শান্ত-সৌম্য অবস্থা যেন "প্রলয়-ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন"-এর অবস্থা। মালিনী ময়নার মনের অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল, এইবার যথাস্থানে আঘাত করা হইয়াছে। তাই সে ইহাকে প্রকৃত সময় মনে করিয়া, বারমাসে বিরহিণীদের কি দুঃখ, তাহা আষাঢ় হইতে আরম্ভ করিয়া মাসের পর মাস বলিয়া যাইতে লাগিল। ময়না আর সহ্য করিতে পারিলেন না, এক মাস পর একবার ভীষণ উত্তর দিতে লাগিলেন। আষাঢ় ও শ্রাবণমাসে বিরহিণীদের দুঃখ বর্ণিত হইলে, ময়না এইরূপ উত্তর দিলেন :—

রাগ—আশাবরী।

"আএ ধাঞি কুজনি কি মোক ছুনাঅছি,
বেদ উকতি নহে পাঠ।
লাখ উপাএ মেটিতে কো পারএ,
জো বিধি লিখল ললাট॥
মালিনি বোলছি অনুচিত বানি,
ধরম ন ছোঅতি তেজিআ সত মতি,
লোর প্রেম করাঅছি হানি॥
মোহোর সুনাঅর গুণের সায়র,
মধুর মূরতি ভেস।
ছো মধু তেজিয়ে কৈছনে বিখ পানাও,
ভাল ধাঞি কহ উপদেস।
তুহি বর পাপিনি পাপ ছুনাঅছি,
ধরম করঅছি বাম।
পাতক ঘাতক ধাঞি মোর চিন্তছি,
জাতি কুল করহ নিণাম॥
দুরান্ত দুরতি দুতিপনা দুর কর,
চিন্তহ মোহোর কল্যাণ
কাজি দৌলতে ভনে দাতা মনে মনোভব
শ্রীযুত আসরফ খান॥"

রাগ—ভৈরব।

"ছাওন গগনে সঘন ঝরে নির।
তঞি আহু ন জুরাএ তাপ ছরির॥ ধু॥
মালিনি কি কহব বেদন ওর।
লোর বিনু বামহি বিহি ভেল মোর॥
মদন অসিক জনি বিজুরির রেহা।
থরকএ রজনি কম্পএ ছব দেহা॥

ন বোল ন বোল ধাত্রি অনুচিত বোল।
আন পুরুখ নহে লোর ছমতুল॥
লাখ পুরুখ নহে লোরক ছরুপ।
কোথাএ গোময় কীট কোথাএ মহুপ॥
গরল ছদৃস পর পুরুখক ছঙ্গ।
ডংসিআ পলাএ জেন কাল ভুজঙ্গ॥
তাহা ছনে পালএ জে প্রেমের অঙ্কুর।
থির ন রহে জাতি পিরিতি দুহুঁ কুল॥
তেজি রিতু মানিএ আবএ লোর।
নতু জীবন জে মরন ছম মোর॥
তছু পাএ ছাজএ ছাওন রছ আছ।
অবিরত কান্তা ন ছোরে কান্ত পাছ॥
বিরহে পীরারি ধনি জপ ইতি নাহা।
আসরফ নায়ক ছব গুণগাহা॥

মালিনীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল; ময়নাবতী সতীত্বের ভিত্তির উপর হিমাচলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি মালিনীকে ইতিমধ্যে খুব ভাল করিয়াই চিনিয়া লইয়াছিলেন, এবং বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়া—

"এত কহি সখী প্রতি ক্রোধে আদেশিল।
কুটনীর কেশ ধরি বহুল তাড়িল॥
বিস্তর মারিআ হেটে ফেলাইল ঠেলি।
মস্তক মুড়াই মুখে দিল চুণকালি॥
ভ্রমাইল নগরে গর্দ্দভে চড়াইআ।
প্রাণে না মারিল ধাত্রি বধ বিবেচিআ॥"

এই খানেই দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হইয়া তৃতীয় খণ্ড আরম্ভ হয়। কবি আলাওলই এই খণ্ডের প্রণেতা। তিনি এই খণ্ডের মধ্যে নানা অবান্তর গল্পের অবতারণা করিয়াছেন; তন্মধ্যে "রত্তন কলিকা ও মদন মঞ্জরীর প্রসঙ্গ" এবং "আনন্দ বর্ম্মার" গল্পই প্রধান। এই গল্পগুলির দ্বারা আলাওল দেখাইয়াছেন যে, সতী নারী ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে, স্বামীর সহিত পরিশেষে তাঁহার মিলন ঘটেই। আলাওল এইরূপেই ময়নাবতীর সহিত লোরের পুনর্মিলন ঘটাইয়া দিয়াছেন। দৌলত কাজী বাঁচিয়া থাকিলে কিরূপে এই পুস্তকের মিলনান্ত উপসংহার করিতেন জানি না, তবে আলাওল যে ভাবে ইহার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন, তাহা দৌলত কাজীর রচিত অংশের সঙ্গে খাপখায় নাই।

কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়, কবি দৌলত কাজী আলাওলের প্রায় সমকক্ষ কবি (১)। আমাদের

(১) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ ১৩২৬ বাং, পৃঃ ২৪৮।

মনে হয়, একটিমাত্র অসমাপ্ত কাব্যে কবি দৌলত যে কবিত্ব সুধা-ধারা বহাইয়া দিয়াছেন ও অমর প্রতিভার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আলাওলের রাশীকৃত অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যেও পাওয়া যায় না। আলাওল কবিত্বের দিক দিয়া দৌলত কাজী হইতে নিঃসন্দেহভাবে নিকৃষ্ট। স্বয়ং কবি আলাওল "সতী ময়নার" পরিসমাপ্তিতে এ কথা স্বীকার করিয়াছেন (১)। যিনি "সতী ময়নার" দুই কবি লিখিত অংশ দুইটি একটু নিবিষ্টভাবে পাঠ করিবেন, তিনি পরের মুখে ঝাল না খাইয়া, পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইবেন, দুই কবির রচনায় কতখানি পার্থক্য বিদ্যমান। স্বীকার করি, কবি আলাওল দৌলত কাজী হইতে পাণ্ডিত্যে অনেকগুণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু রচনার লালিত্যে, ভাষার মাধুর্য্যে এবং অল্প কথায় বা একটি ক্ষুদ্র উপমায় অধিক ভাব প্রকাশের ক্ষমতায়, হতভাগ্য কবি দৌলত কাজী আলাওল হইতে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। দৌলত কাজীর হাতে "ব্রজবুলি" যেমন স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়াছে, আলাওলের হাতে তেমনটি হয় নাই। আলাওল জ্যৈষ্ঠ মাসে বিরহিণীদের দুঃখ প্রকাশ করিতে গিয়া মালিনীর মুখে যে "ব্রজবুলি" আরোপ করিয়াছেন, তাহার সহিত দৌলত কাজীর লিখিত "ব্রজবুলির" তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আলাওল কত কষ্টে এই "ব্রজবুলিটি" লিখিতে গিয়া আপন অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আলাওলের রচিত অংশে পাণ্ডিত্য আছে, শব্দাড়ম্বর আছে, অস্বাভাবিক ও অবান্তর গল্পের সমাবেশ আছে, কিন্তু দৌলত কাজীর রচনায় যে প্রাঞ্জলতা, যে স্বাভাবিকত্ব ও ভাবপ্রকাশক অল্পভাষিতার নিদর্শন আছে, আলাওলের রচিত অংশে তাহা পাওয়া যায় না। এইরূপে বহুগ্রন্থ-প্রণেতা, দীর্ঘজীবী, ও পণ্ডিত আলাওল, দৌলত কাজীর ন্যায় একজন খণ্ডকাব্য-প্রণেতা ও স্বল্পজীবী কবির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন!

আলাওলের সহিত দৌলত কাজীর তুলনা

বলিতে কি, কবি দৌলত কাজীর কবিত্ব অতুলনীয়। নিষ্ঠুর কাল বঙ্গীয় কাব্য-নিকুঞ্জের এই অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ-কলিকাটিকে অকালে ঝড়িয়া পড়িতে বাধ্য না করিলে, কালে ইহার সৌন্দর্য্যচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত ও মনোরম সুরভিতে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিত, সন্দেহ নাই। এখনও বঙ্গীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে তাঁহার স্থান যে অনেক উচ্চে, একথা অস্বীকার করা যায় না। হয়ত, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া আরও অনেক কাব্য লিখিয়া যাইতে পারিলে সোনায় সোহাগা হইত। কিন্তু তিনি যদি তাঁহার বর্ত্তমান অসমাপ্ত কাব্যখানির সবটুকু না লিখিয়া কেবল "বারমাসী" টুকুও লিখিয়া যাইতেন, বাঙ্গালী তাঁহাকে প্রাচীন কবিদের মধ্যে উচ্চে স্থান না দিয়া পারিতেন না। বাস্তবিকই তাঁহার "বারমাসী"র ন্যায় এমন সুন্দর "বারমাসী," অসংখ্য "বারমাসী" পরিপ্লাবিত মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা সাহিত্যে একটিও দেখা যায় না। তাঁহার "বারমাসীটির" অনেক বৈশিষ্ট্য ইহাকে অন্যান্য মামুলী "বারমাসী" হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

দৌলত কাজীর কবিত্ব।

(১) "শ্রীযুক্ত দৌলত কাজী মহাগুণবন্ত।
তানে আদ্য করিআ রচিলুম আদি অন্ত॥
তান সম মোহোর না হয় পদ গাঁথা।
গুণীগণে বিচারিআ কহুক সত্যকথা॥
মহাজন বাক্য সাঙ্গ করিলুম পাঞ্চালী।
ভগ্ন বস্ত্র কার্য্যে লাগে যদি দেএ তালি॥

তাঁহার "বারমাসী" অন্যান্য কবির "বারমাসী"র ন্যায় নায়িকার খেদোক্তি নহে। ইহা মালিনীর মুখ দিয়া ময়নার প্রত্যুত্তরচ্ছলে লিখিত। ইহাতে যে লিপি-চাতুর্য্য ও প্রকাশ-ভঙ্গি দেখা যায়, তাহা আধুনিক যুগের Melo-drama বা গীতি-নাট্যেই দৃষ্ট হয়। মামুলী "বারমাসীতে" নায়িকার মানসিক চাঞ্চল্য ও দৌর্ব্বল্যই ফুটাইয়া তোলা হয়, দৌলত কাজীর "বারমাসী"তে নায়িকার অদ্ভুত আত্মিক শক্তি ও প্রলোভন-বিজয়ী অটল হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহাতে ময়না দেবী, কামদেবের ক্রীড়ার পুত্তলী নহে। ময়নার অনবদ্য চরিত্র কবির অমর তুলিকায় এই বারমাসীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "বারমাসীতে" ব্রজবুলির প্রয়োগ কবি দৌলত কাজীর পূর্ব্বে আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। ব্রজবুলির প্রয়োগে "বারমাসীটিতে" যে মাধুর্য্য ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

কাব্যে হিতোপদেশ

দৌলত কাজী শুধু কবি নহেন, তিনি সদুপদেষ্টাও বটে। তাঁহার কাব্যের নানা স্থানে চমৎকার হিতোপদেশ ছড়াইয়া রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সমুদয় হিতোপদেশ দিতে গিয়া তিনি তাঁহার কাব্যের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেন নাই। এক একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া তিনি আশ্চর্য্যরূপে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (epigrammatic) উপদেশ মুক্তামালার ন্যায় তাঁহার কাব্যের নানা স্থানে ছড়াইয়া দিয়াছেন। এইরূপ কয়েকটি উপদেশ এইরূপ ঃ—

"সুগন্ধি কুসুম শয্যা যাহার শয়ন।
ভূমিগত নিদ্রা যাএ বিধির ঘটন॥"

২

"যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা।
তস্করেত ধর্ম্ম কথা বেশ্যাক ভর্ৎসনা॥

৩

"কাপুরুষ না শোভএ রমণী সম্পাস।
লবন উদকে নহে কুমুদ-বিকাশ॥

৪।

"ভালে ভাল সমযুক্ত মন্দে মন্দ যথা।
বিদ্বানেত বিদ্যা কহি মূর্খেত মূর্খতা॥

৫

"যাহার নির্ব্বন্ধ যেই না যাএ খণ্ডন।"

৬

"কাতরতা কাপুরুষ জনের লক্ষণ।"

৭

"পাখাহীন সাচনক কাকে পরাভবে

৮।

"দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার।
এক যাএ আন আইসে কেহ নহে সার॥
বৃদ্ধের মরণে হএ যুবকের আশ।
হেমন্ত অন্তরে যেন বসন্ত উল্লাস॥
কপট সংসার মায়া কে বুঝিতে পারে।
পিতৃক মারিয়া পুত্র রাজ্য অধিকারে॥" ইত্যাদি।

যে দিক হইতেই বিচার করিতে বসি, সেদিক হইতেই দেখিতে পাই, দৌলত কাজী একজন অসাধারণ কবি। যে স্বভাবজাত ক্ষমতা ও কবিত্বময় প্রাণ লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক কোন কবির মধ্যে যে দেখিতে পাই না তাহা নহে, তাঁহার পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী কবির মধ্যেও কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তাঁহার কাব্য পাঠে আমরা শুধু ক্ষণিক আনন্দ উপভোগ করি না, রস গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত হই না,—ইহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। তাঁহার অনেক কথা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করে এবং ইহাকে আর ভুলিতে পারা যায় না। পাঠক তাঁহাকে জয় করিতে পারেন না, তিনি পাঠককে অতি সহজেই জয় করেন,—ইহার চেয়ে কৃতিত্বের কথা কবির পক্ষে আর কি হইতে পারে? কবি দৌলত কাজী এই গুণেই অমর। সমগ্র পূর্ব্ব বঙ্গের, বিশেষতঃ চট্টলার সহস্র সহস্র পাঠকের হৃদয়-রাজ্যে আজও তাঁহার অনুপম মর্ম্মর-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, এবং চিরদিনই করিবে। বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না, বাঙ্গালী তাঁহাকে বিস্মরণ-বেদীতে বিসর্জ্জন দিবে না। তাঁহার কাব্য বঙ্গ-সাহিত্যের অমর অবদান। তিনি তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, "সাফল্য জীবন যার রহিল সুনাম"। সত্যই যত দিন বঙ্গ-সাহিত্য বাঁচিবে, ততদিন কবি দৌলত কাজীর সুখ্যাতি অটুট থাকিবে। স্বল্পজীবী কবির জীবন সফল হইয়াছে, তাঁহার সুখ্যাতি আজ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবি

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ :—

কোরেশী মাগন ঠাকুর

রোসাঙ্গ-রাজসভায় থাকিয়া যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন, কবি মাগণ তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে নিতান্তই অপরিচিত লোক নহেন। "কৃষ্ণ-চন্দ্রীয় যুগের" পথপ্রদর্শক মহাকবি অলাওলের (১) প্রসাদে, ইনি বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের নিকট বেশ একটু সুপরিচিত (২)। কিন্তু বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার যে পরিচয় ঘটিয়াছে, তাহা মুখ্যভাবে নহে, বরং গৌণভাবে; কেননা বাঙ্গালী তাঁহাকে মহাকবি আলাওলের সাহায্যদাতা ও কাব্য-সাধনার সহায়করূপেই জানেন। যদিও তিনি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন মস্ত বড় পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সাহিত্যে স্থানলাভ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত কেহই বাঙ্গালা সাহিত্যের স্রষ্টা ও সাধক হিসাবে জানেন নাই। সম্প্রতি "চন্দ্রাবতী" নামে একখানি বিরাট কাব্য খণ্ডিত আকারে আবিষ্কৃত হওয়ায়, বাঙ্গালী পাঠকের সহিত কবি হিসাবে তাঁহার নূতন পরিচয় হইবে, সন্দেহ নাই।

ভূমিকা।

"চন্দ্রাবতী" কাব্যখানি মাত্র বছর দুই পূর্ব্বে চট্টগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হয়। পুথীখানি খণ্ডিত,—প্রথম দ্বাদশ পত্র এবং শেষের দিকেও ১২৪ পত্রের পরবর্ত্তী পত্রগুলি নাই। সুতরাং পুথীখানির আরম্ভ ও শেষ না থাকায়, কবির আত্মবিবরণী, পুস্তক প্রণয়ণের তারিখ বা হস্তলিপির সাল কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয়, পুথীখানির গর্ভস্থ অনেক পত্র হারিয়া গিয়াছে বলিয়া, পুস্তকে বর্ণিত বিষয়টি বিশদভাবে বুঝিতে বেশ একটু বেগ পাইতে হয়। পুস্তকটির স্থানে স্থানে চট্টগ্রাম জেলার ফতেনগর-নিবাসী আবুল হোসেন চৌধুরী নামক কোন এক ব্যক্তি মালিক বলিয়া লিখিত আছে। আরও জানিতে পারা যায়, শরফুদ্দীন চৌধুরীর পুত্র শ্রীশুজাউদ্দীন কর্ত্তৃক পুথীখানি "অক্ষর মিদং" অর্থাৎ অনুলিখিত হইয়াছিল। তাঁহার হস্তাক্ষর বেশ পরিষ্কার ও সুন্দর। প্রাচীন ১২"×৭" তুলট কাগজের দুই পৃষ্ঠে পুথীখানি লিখিত। কাগজ ও অক্ষর দেখিয়া মনে হয়, ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে পুথীখানি অনুলিখিত হয়।

"চন্দ্রাবতীর" পাণ্ডুলিপির পরিচয়।

---

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (পঞ্চম সংস্করণ)—দীনেশ চন্দ্র সেন, পৃঃ ৪৭৮-৪৮৯।

(২) প্রাগুক্ত—পৃঃ ৪৮০।

সে যাহা হউক, পুথীখানিতে কবির কোন আত্মবিবরণী পাওয়া না গেলেও, ইহার স্থানে স্থানে যে ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, পুথী-খানি মহাকবি আলাওলের শরণদাতা মাগণ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। আলাওলের শরণদাতা মাগণ ঠাকুর ও "চন্দ্রাবতী" কাব্য-প্রণেতা মাগণ যে এক ব্যক্তি এহেন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণগুলি এইরূপ :—

"চন্দ্রাবতী" প্রণেতা মাগণ কে ?

"চন্দ্রাবতীর" বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপির একাদশ স্থানে কবির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে এই তিনটি ভণিতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আবশ্যক :—

১

"শুন শুন চন্দ্রসেন রাজা গুণধাম।
শান্ত হৈল কোরেশী মাগণ গুণনাম ॥"

২

"কোরেশী মাগণে কয়, তুমি প্রভু দয়াময়,
তুমি বিনে গতি নাহি আন।
এ চৌদ্দ ভুবন মাঝ, তুমি কর্ত্তা তুমি রাজ,
তুমি প্রভু সঙ্কট তরাণ ॥"

৩

"ক্ষমা কর বীরভান, না কর কান্দন।
ক্ষমাতে সদয় প্রভু কহিল মাগণ ॥"

বলা বাহুল্য, অপর ভণিতাগুলিতেও কবির নাম উদ্ধৃত ভণিতাগুলির কোন একটিরই অনুরূপ। সুতরাং এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র।

উপর্য্যুদ্ধৃত ভণিতাগুলির প্রথম সংখ্যক ভণিতা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি, কবির প্রকৃত নাম মাগণ নহে, ইহা একটি "গুণনাম" অর্থাৎ কোন বিশেষ কারণবশতঃ প্রাপ্ত নাম, ইহাকে "ডাক নাম"ও বলা যাইতে পারে, এবং তিনি "কোরেশ বংশ" (হজরত মোহাম্মদ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সে বংশ)-সম্ভূত মুসলমান। দ্বিতীয় সংখ্যক ভণিতায়, কবি "কোরেশ"-বংশসম্ভূত মুসলমান ছিলেন—এ কথাতেই জোর দিয়াছেন, এবং তৃতীয় সংখ্যক ভণিতায় শুধু নামটিই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত ভণিতায় আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, তিনি কোথাও "দীন," "হীন," "অধীন" প্রভৃতির ন্যায় সচরাচর কবি প্রচলিত বিনয়-বাক্য ব্যবহার করেন নাই। ইহার কারণ কি ? এখন এই কয়েকটি কথার পরীক্ষা করিয়া বিচার করিয়া দেখিব এই "মাগণ" কে ?

বিচার্য্য বিষয়।

মহাকবি আলাওল তাঁহার "পদ্মাবতী" ও "সয়ফুল মুলুক" নামক কাব্যদ্বয়ে তাঁহার আশ্রয়দাতা

মাগণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। যদি মহাকবির প্রদত্ত বিবরণের সহিত উপর্যুক্ত ভণিতা-প্রদত্ত বিবরণের মিল ঘটে, তবে "চন্দ্রাবতী"-প্রণেতা মাগণ ও আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগণ যে এক ব্যক্তি ছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে (অন্ততঃ অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত) বাধা কি?

"চন্দ্রাবতী"—প্রণেতা মাগণ ও আলাওল বর্ণিত মাগণ এক ব্যক্তি কি না?

প্রথমতঃ আমরা দেখিতেছি, আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগণ একজন মহা পণ্ডিত ও কাব্য-রস-পিপাসু ব্যক্তি ছিলেন; তিনি যে শুধু নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তেমন নহে, অধিকন্তু তিনি নানা শিল্পেও বিশারদ ছিলেন। যিনি এতগুলি গুণের অধিকারী ছিলেন, তিনি যে কবিত্ব-শক্তি সম্পন্ন লোক ছিলেন না, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। যিনি কাব্য ও অলঙ্কার জানিতেন, যাঁহার হস্তে নাটক-নাটিকা শোভা পাইত (১), তাঁহার পক্ষে কবি না হওয়ার চেয়ে কবি হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। হয়ত, তিনি "চন্দ্রাবতী" কাব্য লিখিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কবি ছিলেন বলিয়াই, তাঁহার কাছে কবি আলাওল সমাদর লাভ করিয়াছিলেন (২) বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগণ শেখ্-বংশজাত সিদ্দীকী গোত্রভুক্ত ছিলেন (৩), আর "চন্দ্রাবতী" কাব্যের মাগণ ছিলেন কোরেশ-বংশজাত। এই যে দুই কবির বংশ সম্বন্ধে বাহ্যিক বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বিরোধই নহে বরং একই বংশের কথা দুই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। কেননা প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান অবগত আছেন যে, হজরত মোহাম্মদের কন্যাপক্ষীয় অধস্তন পুরুষেরাই কেবল "সৈয়দ" নামে পরিচিত এবং অপরাপর সকলেই, অর্থাৎ সকল কোরেশ বংশীয় ব্যক্তিদের অধস্তন পুরুষেরাই "শেখ্" নামে সাধারণতঃ পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং বিশেষ বিশেষ

(১) (ক) "আরবী, ফারসী আর মঘা হিন্দুয়ানী।
নানাগুণ-পারগ সঙ্গীতজ্ঞাতা গুণী।
কাব্য-অলঙ্কার জ্ঞাতা হস্তেক নাটিকা।
শিল্প, গুণ, মহৌষধি, নানাবিধ শিক্ষা॥ (পদ্মাবতী)

(খ) "হেন মহামহিম মাগণ গুণনিধি।
গুণরাশি দিয়া তাঁরে সৃজিলেক বিধি॥" (সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল)

(২) আপনে আলিমাধিক বিদ্যায় নিপুণ।
গুণবন্ত হইলে সে বুঝয়ে গুণাগুণ॥ (সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল)

(৩) (ক) "সিদ্দীক বংশেতে জন্ম শেখ্জাদা জাত।
কুলেশীলে সংকর্ম্মে ভুবন বিখ্যাত॥" (সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল)

(খ) "একমহাপুরুষ আছিল সেই দেশে।
মহাসত্য মুসলমান সিদ্দীকের বংশে॥ (পদ্মাবতী)

ক্ষেত্রে এই "শেখ্"দেরই বিশিষ্ট পুরুষদের (যেমন আবু বকর সিদ্দীক্ হইতে "সিদ্দীকী", উমর ফারুক্ হইতে "ফারুকী") অধস্তন পুরুষেরা বিশিষ্ট গোত্রের নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং "চন্দ্রাবতীর" কবি "মাগণ কোরেশীকে" যদি আলাওল "মাগণ সিদ্দীকী" বলিয়া থাকেন, তাহাতে উভয়ের এক ব্যক্তি হইবার পক্ষে কোন বাধা জন্মে না।

তৃতীয়তঃ, আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগণেরও প্রকৃত নাম "মাগণ" নহে, তাঁহার অন্য কোন আরবী বা ফারসী নাম ছিল; কিন্তু তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট তাঁহার "গুণনাম" বা বিশেষ কারণবশতঃ প্রাপ্ত নাম অর্থাৎ ডাক নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মাতা পিতা বহুদিন যাবৎ নিঃসন্তান থাকিয়া খোদার নিকট বহু আরাধনা ও প্রার্থনা করিয়া "মাগিয়া" সন্তান লাভ করেন বলিয়াই তাঁহাকে আদর করিয়া "মাগণ" নামে ডাকনাম অর্থাৎ "গুণনাম" দিয়াছিলেন (১) "চন্দ্রাবতী"র কবিরও ইহা প্রকৃত নাম নহে "গুণনাম" মাত্র। সুতরাং, দুই ব্যক্তিকে এক ব্যক্তি বলিয়াই মনে হইতেছে।

চতুর্থতঃ, "চন্দ্রাবতীর" কবি মাগণ কোন কবি-প্রচলিত বা অপ্রচলিত বিনয়-বাক্য ভণিতায় প্রয়োগ করেন নাই। তিনি যদি সাধারণ লোক হইতেন এবং মহোচ্চ পদস্থ ব্যক্তি না হইতেন, তবে নিশ্চয় চিরাচরিত বিনয়-বাক্য ব্যবহার করিতেন। তিনি মহোচ্চ পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন বলিয়াই, চিরাচরিত বিনয়-বাক্য ব্যবহার করা আবশ্যক মনে করেন নাই বলিয়া মনে হয়। আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগণও একজন মহোচ্চ পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি রোসাঙ্গ (আরকান) রাজের প্রধান মন্ত্রী (মুখ্য পাত্র) ছিলেন (২)। যিনি একটি বিশাল সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, কাব্য লিখিতে গিয়া, তাঁহার পক্ষে চিরাচরিত অর্থহীন বিনয়-বাক্য ব্যবহার না করার সম্ভাবনাই অধিক।

উপর্য্যুক্ত কারণ-পরম্পরায় দেখিতেছি, আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগণের সহিত "চন্দ্রাবতী"র কবি

(১) (ক) "মহাদেবী (মাগণের মাতা) মাগি পুত্র পাইলা প্রভুস্থান।
ঠাকুর "মাগণ" নাম থুইলা তেকারণ॥" (সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল)

(খ) "প্রভুস্থানে মাগি পাইল পরারথনা করি।
তেকারণে ঠাকুর "মাগণ" নাম ধরি॥" (পদ্মাবতী)

(২) (ক) "শৈশবের পাত্র দেখি বহু স্নেহ ভাবি।
মুখ্য পাত্র করিয়া রাখিল মহাদেবী॥" (পদ্মাবতী)

(খ) মুখ্য পাটেশ্বরী যদি হৈল যশস্বিনী।
মুখ্য অমাত্য হইল মাগণ গুণমণি॥" (সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল)

অন্যত্র

"রোসাঙ্গের রাজপাত্র শ্রীযুত মাগণ।
সয়ফুল মুলুক গ্রন্থ করাইল রচন॥" (ঐ)

মাগণের অনেক বিষয়ে হুবহু মিল রহিয়াছে। আকস্মিকভাবে দুই একটি বিষয়ের মিল হইতে পারে, এতগুলি বিষয়ের একত্র সমাবেশে স্বতঃই মনে হয়, দুই ব্যক্তি এক; অন্ততঃ কবির স্বরচিত আত্মকাহিনী আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অনুমান অসত্য হইবার কোন কারণ দেখি না। এখন কেবল একটি বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে,—"চন্দ্রাবতীর" ভণিতাগুলিতে "ঠাকুর" কথাটি বাদ পড়িয়াছে কেন? বলা বাহুল্য "ঠাকুর" রোসাঙ্গ-রাজ-প্রদত্ত উপাধি মাত্র, ইহা কবির নাম নহে। আমরা জানি,—এখনও সাধারণ লোক রোসাঙ্গে বড় ও পদস্থ লোক দিগকে "ঠাকুর" নামে আহ্বান করিয়া থাকে। বিশেষতঃ "ঠাকুর" যে "মঘ" রাজার উপাধি ছিল, তাহা আলাওল হইতেও আমরা জানিতে পারি। মাগণ ঠাকুরের পিতার উপাধিও "ঠাকুর" ছিল; তিনি রোসাঙ্গ-রাজের সমর-সচিব (সৈন্য মন্ত্রী) ছিলেন (১)। তাই আলাওল তাঁহাকে "বড় ঠাকুর" নামে পরিচয় দিয়াছেন। ইহা যদি নাম হইত, তবে পিতা পুত্রের নাম এক হইত, অথচ ইহা অসম্ভব। "ঠাকুর" শব্দটি উপাধি হইলেও, "চন্দ্রাবতীর" ভণিতায় তাহা বাদ পড়িল কেন? বলাবাহুল্য আলাওল যখন স্বীয় আশ্রয়দাতার গুণগান করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহার আশ্রয়দাতার উপাধি বাদ দিলেন কিরূপে? "চন্দ্রাবতীতে" কবি নিজের উপাধি নিজে লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ, আলাওলের কাব্যের অসংখ্য স্থানেও শুধু "মাগণ" কথা লিখিত আছে (২)। সুতরাং "ঠাকুর" কথা "চন্দ্রাবতীতে পাওয়া না গেলেও দুই জনকে পৃথক পৃথক ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগণই চন্দ্রাবতী কাব্য রচয়িতা।

মাগণের পরিচয় "চন্দ্রাবতী" কাব্যে পাওয়া না গেলেও, এখন আমরা উপরের আলোচনা ও আলাওল হইতে তাঁহার নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত পরিচয় অতি সহজেই লাভ করিতে পারি।

কবি ঠাকুর মাগণ কোরেশী শেখ-বংশজাত সিদ্দীকী গোত্রভুক্ত মুসলমান ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম মাগণ নহে; তাঁহার নিঃসন্তান মাতাপিতা আল্লার নিকট বহু আরাধনা করিয়া "মাগিয়া" লাভ করেন বলিয়া, তাঁহাকে "মাগণ" নামে অভিহিত করিতেন; তিনি এই নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। তিনি রোসাঙ্গ-রাজ থিরি সান্দ থুধম্মার (শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা) রাজত্বকালে ঐই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী (মুখ্য পাত্র) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন থিরি সান্দ থুধর্ম্মা (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রীঃ) যখন তদীয় পিতা থদো বা থদো মিন্তার

মাগণ ঠাকুরের পরিচয়

(১) (ক) "রাজ সৈন্যমন্ত্রী ছিল বড়ই ঠাকুর।
প্রভুতে মাগিয়া পাইল গুণদেব সুর॥" (পদ্মাবতী)

(খ) "রাজ্যপাল সৈন্যমন্ত্রী আছিলেন তান।
শ্রীবড় ঠাকুর নাম জগত বিখ্যাত॥ (সয়ফুল মুলুক)

(২) (ক) "এহেন মাগণ গুণী, রূপভাব কথা শুনি,
জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ।" (পদ্মাবতী)

(খ) সদগুণ মাগণ নাম, রোসাঙ্গেতে অনুপাম" (পদ্মাবতী)

(গ) শ্রীযুত মাগণ, আরতি কারণ
হীন আলাওলে ভণে।" (পদ্মাবতী)

(ঘ) "শ্রীযুত মাগণ ধীর রসিক সুজন।" (সয়ফুল মুলুক)

(আলাওলের চদো উমংদার বা সাদ উমংদার—১৬৪৫-১৬৫২ খ্রীঃ)-এর মৃত্যুর পর আরকান-সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি অপোগণ্ড শিশু ছিলেন। তিনি রাজ্য-পরিচালনায় অসমর্থ হইবেন ভাবিয়া, অমাত্যদের পরামর্শমতে তাঁহার বিধবা মাতা তৎপরিবর্ত্তে নিজেই রাজকার্য্য চালাইতে থাকেন, এবং মাগণ ঠাকুরকে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী-পদ দান করেন (১)। মাগণের পিতা "বড় ঠাকুর"ও রোসাঙ্গ-রাজের সমর-সচিব "সৈন্য মন্ত্রী" ছিলেন। পিতাপুত্র উভয়েই রোসাঙ্গ-রাজ-প্রদত্ত "ঠাকুর" উপাধিভূষিত ছিলেন।

মাগণ যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান ছিলেন। তাঁহার ন্যায় নানা গুণশালী মণীষী তৎকালে রোসাঙ্গে ছিল না। তিনি আরবী, ফারসী, বর্ম্মা ও সংস্কৃত ভাষা জানিতেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার কতখানি অধিকার ছিল, "চন্দ্রাবতী" কাব্যই তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। এই সমুদয় ভাষা ব্যতীত, তিনি সঙ্গীত, নাট্য, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। ভৈষজ্য ও যাদুবিদ্যা (গুণ) এবং আরও বহু ব্যবহারিক বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন বলিয়াও জানা যায়।

কবি মাগণ যেমন ধনে, মানে, জ্ঞানে ও যশে রোসাঙ্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, তেমনই তিনি একজন মহৎ ও উদার-হৃদয়-ব্যক্তি ছিলেন বলিয়াও জানা যায়, তাঁহার বদান্যতা ও উদারতায় দীন দরিদ্র

(১) "নৃপতিগিরির * কন্যা পরম সুন্দরী।
চদো † নৃপতির ছিল মুখ্য পাটেশ্বরী॥
চদো উমংদার ‡ যদি গেল পরলোকে।
ব্রতধর্ম্ম আচরি রহিল স্বামী শোকে॥
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা§ নৃপতি শিশু দেখি।
সকল অমাত্যগণ হইল একমুখী॥
দণ্ডবৎ হৈয়া মহাদেবীর গোচর।
কহিতে লাগিলা সবে বিনয় উত্তর॥
শিশু নৃপে কেমতে পালিব বসুমতী॥
পুত্রে রাজা করিয়া আপনে পাল ক্ষিতি॥
মুখ্য পাটেশ্বরী যদি হইল যশস্বিনী।
মুখ্য অমাত্য হৈল মাগণ গুণমণি॥"

(সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল)

*. নৃপতিগিরি = নরবদিগ্যী (Nara-ba-di-gyi = নৃপগৃহ—১৬৩৮—১৬৪৫ খ্রীঃ)

†. চদো = থদো = থদো মিন্তার (Thado or Thado Mintar = সাদ উমংদার বা চদো উমংদার—১৬৪৫—১৬৫২ খ্রীঃ)

‡. চদো উমংদার = চদো = থদো = Thado = Thado Mintar—1645—1652 A. D.

§ শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা = থিরি সান্দ থুধম্মা = Thiri Sanda Thudhamma—1652—1684 A.D.

পালিত হইত, সহায়হীন আশ্রয় পাইত, রাজরোষে নিপীড়িত ব্যক্তি উদ্ধার লাভ করিত (১)। বাস্তবিকই মহাকবি আলাওল তাঁহার নামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছেন, মাগণ ঠাকুরের পক্ষে তাহা যে কবি জনোচিত অতিশয়োক্তি ছিল তেমন মনে হয় না; এ স্থলে তাই তাহা উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"মান্যের 'ম'-কার আর ভাগ্যের 'গ'-কার।
শুভযোগে নক্ষত্রের আনিল 'ন'-কার॥
এ তিন অক্ষরে নাম "মাগণ" সম্ভবে।
রাখিলেক মহাজনে অতি মনোৎসবে॥
আর এক কথা শুন পণ্ডিত সকল।
কাব্যশাস্ত্র-ছন্দ-মূল পুস্তক "পিঙ্গল"॥
"পিঙ্গলের" মধ্যে অষ্ট 'মহাগণ'-মূল।
তাহাতে 'মগণ' আছে শুন কবিকুল॥
নিধি স্থির কল্প প্রাপ্তি 'মগণ' ভিতর।
'মগণ', 'মাগণ' এক আকার অন্তর॥
আকার সংযোগে নাম হইল 'মাগণ'।
অনেক মঙ্গল ফল পাএ তে-কারণ॥"

(পদ্মাবতী)

কবি মাগণ ঠাকুর কোথায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তবে তাহার স্থায়ী নিবাস যে রোসাঙ্গে ছিল না, এ কথা সত্য। তৎরচিত "চন্দ্রাবতী" কাব্য পাঠে দেখা যায়, তিনি কাব্যটির স্থানে স্থানে খাস চট্টগ্রামী কথ্য ভাষায় (dialect) ব্যবহৃত এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা বাঙ্গালা ভাষার আর কোন কথ্য ভাষায় (dialect) ব্যবহৃত হয় বলিয়া আমাদের জানা নাই; যেমন, তিনি "ভেলা" অর্থে "ভুর", "ছাড়িয়া দিল" অর্থে "এরি দিল", "ঘেরা" অর্থে "ছান্ধা",

মাগণের বাসস্থান চট্টগ্রাম জেলায়।

(১) 'ওলামা, সৈয়দ, শেখ যত পরবাসী।
পোষেন্ত আদর করি মনে স্নেহ বাসি॥
কাহাকে খতিব, কাকে করেন্ত ইমাম।
নানা বিধ দান দিয়া পূরান্ত মনস্কাম॥
নৃপক্রোধে যত লোক হয় ছএাকার।
তাহান স্মরণে আইলে হয়েন্ত উদ্ধার॥"

(পদ্মাবতী)

"বারংবার সাবধান করার" অর্থে "দরাই করা" (১) প্রভৃতির ন্যায় বিশিষ্ট চট্টগ্রামী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, তাঁহার নিবাস চট্টগ্রাম জেলার কোথাও ছিল; নতুবা তাঁহার পক্ষে এবংবিধ বিশিষ্ট চট্টগ্রামী শব্দ কাব্যে ব্যবহার করা সম্ভবপর হইত না।

মৃত্যু ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে।

রোসাঙ্গেই কবি মাগণ ঠাকুরের কর্ম্মস্থল ছিল, এবং এখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ অতি সহজেই লাভ করা যায়। মহাকবি আলাওলের "সয়ফুল মুলুক" নামক কাব্যে দেখিতে পাই, মাগণ ঠাকুরের আদেশেই তিনি এই কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন; কিন্তু কাব্যখানির পরিসমাপ্তি ঘটিবার পূর্ব্বে, মাগণ পরলোক গমন করায়, কাব্যখানি অসমাপ্ত থাকিয়া যায়; এবং এই সময়েই সুলতান শাহ শুজা আরকান রাজ-দরবারে আশ্রয় লইয়া রাজরোষে পড়িয়া নিহত হইয়াছিলেন (২)। ইতিহাসে দেখিতে পাই, সুলতান শাহ শুজা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দেই আরকান-রাজ থিরি সান্দ থুধম্মার হাতে নিহত হইয়াছিলেন (৩)। তাহা হইলে, কবি মাগণ ঠাকুর যে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দেই পরলোক গমন করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাগণের কবিত্ব

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কবি মাগণ ঠাকুর নানা গুণশালী ও বহুশাস্ত্রবিদ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব বহুমুখী ছিল। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা রসাল কবিত্ব-মাধুরীতে মধুময় হইয়াছিল। রোসাঙ্গ-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া তিনি যে কাব্য-লক্ষ্মীকে ভুলিতে পারিয়াছিলেন না, এবং যথাশক্তি তাহার সেবা করিয়া গিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নহে। তাঁহার

(১) কাষ্ঠসব একত্র করিয়া ভুর বান্ধি।
বহুল প্রকার করি চতুর্দ্দিকে ছান্ধি॥
তাহাতে বসাইল কন্যা কুমার সুন্দর।
এরি দিল ভুরখানি সাগর ভিতর॥
* * *
কোন স্থানে না কহিতে দরাই করিল।
আদি অন্ত সব কথা সইতে কহিল॥ (চন্দ্রাবতী)

(২) "মহাদেবী মুখ্য পাত্র শ্রীযুত মাগণ।
সয়ফুল মুলুক গ্রন্থ করাইল রচন॥
সাঙ্গ না হইতে পুথী পাইল পরলোক।
কতকাল মোর মনে আছিল সে শোক॥
তার পাছে শাহ শুজা নৃপ কুলেশ্বর।
দৈব পরিপাকে আইল রোসাঙ্গ শহর॥
রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে করি বিসংবাদ।
আপনার দোষ হস্তে পাইল অবসাদ॥"

(৩) History of Burma—Lieut.-General Sir A. P. Phayre. (1884, London.) P.P. 178 179.

"চন্দ্রাবতী" কাব্যখানি কবিত্বের অফুরন্ত ভাণ্ডার ও কাব্য-কলার চরম নিদর্শন না হইলেও, তাহার স্থানে স্থানে মুক্তার ন্যায় কবিত্ব ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহার নানা কার্য্যলিপ্ত প্রাণ যখনই অবসর পাইয়াছে, তখনই কবিত্বের মাধুরী ছড়াইয়া দিয়াছে। নমুনা স্বরূপ এই কয়টি পংক্তি দ্রষ্টব্য ঃ—

১।

"বরিষার মেঘে যেন বরিষয়ে ধারা।
বসন তিতিল নিত্য নয়নের ঝারা॥
বসিয়া চাতক বৃক্ষে বলে পিউ পিউ।
বাণ হানে তার স্বরে দেহা প্রাণ জীউ॥"

২।

"মাথে জটা দিব্য ফোটা কটিতে কৃপাণ।
হস্তেত গাণ্ডীব, দেব ইন্দ্রের সমান॥"

কবি মাগণ ঠাকুর সামুদ্রিক দৃশ্য বর্ণনায় সিদ্ধ হস্ত। আমরা তাঁহার কাব্যে ইন্দ্রপুরী-সমতুল্য দ্বীপের বর্ণনা পড়িয়া যেমন আনন্দিত হইয়াছি, আবার তেমন জলধি-কল্লোল ও সামুদ্রিক ঝঞ্চার ভয়াবহ বর্ণনা পাঠ করিয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছি। একদিকে "জালিয়া", "গোরাব" ইত্যাদি সহস্র সহস্র নৌকার অভিযান দেখিয়া মনে হইয়াছে, সমুদ্র বুঝি পরাজিত হইল, আবার অন্যদিকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশাল নৌ-বহর সমুদ্রের প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তির সম্মুখে তৃণবৎ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া প্রভাত-কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিলীন হইয়া যাইতে দেখিয়া মনে হইয়াছে, সমুদ্র তোমার লীলা কি ভীষণ!

চন্দ্রাবতীর সমালোচনা

বাস্তব ও অবাস্তবের মিলনে, প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের সামঞ্জস্যসাধনে এই কবি সিদ্ধ হস্ত। এই দুই বস্তুর সমাবেশে সমগ্র কাব্যখানি পাঠককে টানিয়া মর্ত্ত্যের ধূলিকণা হইতে বহু ঊর্দ্ধে রূপকথার রাজ্যে লইয়া যায়। বাস্তবিকই কাব্যখানির প্রচ্ছদপট মর্ত্ত্যের হইলেও, ইহাতে যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহা রূপকথার মাধুরী-তুলিকায় অঙ্কিত। কবি পূর্ব্ববঙ্গের একটি সর্ব্বজনপ্রিয় রূপকথাকে আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া মোহন তুলিকায় অঙ্কন করিয়াছেন। কাব্যখানির ভিত্তি রূপকথার উপর স্থাপিত হইলেও, কবি ইহাকে যে ভাবে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাহাতে কবির প্রচুর মৌলিকত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত ও মানবীয় মাধুর্য্যে (human interest) ভরপুর। খ্যাতি শুনিয়া প্রেমে পড়িবার কথা জগতের প্রেমিক-প্রেমিকার ইতিহাসে নূতন না হইলেও, এই কাব্যের নায়ক বীরভান তদীয় প্রেমিকা চন্দ্রাবতীর প্রতি যে অগাধ প্রেম পোষণ করিতেন, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে দেখাইতে গিয়া বীর প্রেমিকের নূতন আদর্শই আমাদের মানস-সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার বাল্যবন্ধু ও আপদ-বিপদের

সাথী "সুত" যে বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ইতিহাসেও বড় বেশী দৃষ্ট হয় না। তিনি বন্ধুর প্রণয়ে, নবপরিণীতা প্রিয়ার প্রেম ভুলিয়াছিলেন, নিজের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর উদ্দেশ করিবার জন্য নানা দেশে, নানা বেশে, দীর্ঘ দিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কবি তাঁহার কাব্যে যে চিত্রটি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :—

ভদ্রাবতী নগরে চন্দ্রসেন নামে এক রাজা বাস করিতেন। সঞ্জয় নামে তাঁহার এক মহাপাত্র ছিল। কাব্যের নায়ক মহাবীর বীরভান রাজার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তিনি পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন বলিয়া, রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। বীরভান শৌর্য্য, বীর্য্য ও সামরিক বিদ্যায় অচিরকাল মধ্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠায় দেশে দেশে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। মন্ত্রী সঞ্জয়-পুত্র "সুতের" সহিত তাঁহার আবাল্য প্রণয় ছিল। বীরভান ও সুতের প্রণয় এতই অচ্ছেদ্য ও গভীর ছিল যে, উভয়ে এক সঙ্গে খাইতেন, উঠিতেন, বসিতেন, এমন কি বাঁচিতে ও মরিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহাদের এহেন অকৃত্রিম প্রণয়ের কথা মহাপাত্র সঞ্জয় সম্যক্ অবগত ছিলেন।

কাব্যের বর্ণিত বিষয়।

এই সময়ে সুরপাল নামে অন্য এক রাজা সরন্দ্বীপ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। চন্দ্রাবতী নাম্নী তাঁহার এক অপূর্ব্ব সুন্দরী ও লাবন্যবতী অনূঢ়া কন্যা ছিলেন। চিত্রাবতী নামে চন্দ্রাবতীর এক সখী ছিলেন; তিনি চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। কালক্রমে চন্দ্রাবতীর রূপের কথা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

বলাবাহুল্য, চন্দ্রাবতীর অপ্সরা-বিনিন্দী রূপের কথা বীরভানের কানে পৌঁছে এবং বীরভানের অপূর্ব্ব শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা চন্দ্রাবতী লাভ করেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের গুণের কথা শুনিয়া, তাঁহাদের মধ্যে অদর্শনে প্রেম জন্মে এবং উভয়ে উভয়কে লাভ করিবার জন্য প্রাণের নিবিড়তম প্রদেশে আকুল বাসনা পোষণ করিতে থাকেন। রূপকথার নায়িকার ন্যায় এই কাব্যের নায়িকা চন্দ্রাবতী নিশ্চলভাবে বসিয়া না থাকিয়া কিংবা পাগলিনীর বেশে গৃহত্যাগ না করিয়া প্রেমের অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইতে, যে স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও অকৃত্রিমতার আদর্শ লোক সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা রূপকথার নায়িকায় কোথায় মিলিবে? নায়কের পক্ষ হইতে নায়িকালাভের অভিযান আরম্ভ হয়, কিন্তু এই অভিযানে উন্মত্ততা নাই, মস্তিষ্ক বিকৃতি নাই, আছে প্রিয়ার উদ্দেশে বীরের অভিযান।

নায়ক বীরভান নায়িকা চন্দ্রাবতীকে লাভ করিবার জন্য, তদীয় বন্ধু সঞ্জয়-পুত্র "সুত"সহ সহস্র নৌকা লইয়া সমুদ্রপথে সরন্দ্বীপ উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। রাজা চন্দ্রসেন পুত্রকে বিদায় দিয়া তাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের আশঙ্কায় একান্তই উদ্বিগ্ন ও অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার কপোল বহিয়া অবিরলধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে, মহাপাত্র সঞ্জয় তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতেছেন :—

"শুন শুন মহারাজ না কান্দিও আর।
কুমার সেবক সুত তনয় আমার॥
সঙ্কট পড়এ যদি উপরে তাহার।
নিজ প্রাণ দান দিয়া করিব উদ্ধার॥

যাবতে থাকএ জীব সুতের ঘটেতে।
পড়িতে নারিব রাজপুত্র সঙ্কটেতে ॥

সুরপাল রাজাএ তোমার পুত্র জানি।
চন্দ্রাবতী সমর্পিব আপ ভাগ্য মানি ॥"

মহাপাত্রের সান্ত্বনা-বাক্যে রাজা অশ্রু সংবরণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় প্রবোধ মানিল না; তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে কুমার "সুত সঙ্গে নৌকা পন্থে করিলা পয়ান"। তিনি বিমর্ষ মনে দিন কাটাইতে লাগিলেন, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিলেন, দেশের শাসন-কার্য্য আর চলে না; তাই মহাপাত্র সঞ্জয় "রাজকার্য্য করে নিত্য পুস্তকে দেয়াই"।

এদিকে বীরভানের নৌ-বহর সমুদ্রপথে প্রিয়ার উদ্দেশে ছুটিয়া চলিল। সন্ধ্যা-সমাগমে তাঁহারা সম্মুখে এক চড়াজাতীয় দ্বীপ দেখিতে পাইলেন। দ্বীপটি বড়ই সুন্দর; কবির ভাষায়,

"উচ্চ নীচ নাহি কিছু একই সমান।
দেখিতে সুন্দর যেন স্বর্গে ইন্দ্রস্থান ॥

দ্বীপটিতে তাঁহারা নৌ-বহর রাখিয়া নিশাযাপন করিতে মনস্থ করিলেন। 'সুতে'র পরামর্শে অর্দ্ধেক সৈন্য নৌকায় ও অর্দ্ধেক তীরে রহিল,—যেন সমুদ্রে রাত্রিকালে কোন বিপদ ঘটিলে অর্দ্ধেক সৈন্য রক্ষা পায়। রাজপুত্র ও মন্ত্রী-তনয় এক বৃক্ষের উপরে থাকিয়া রাত কাটাইতে স্থির করিলেন। কিন্তু, হায় বিধি বাম হইল, সাধে বাধ ঘটিল,—

"সন্ধ্যা গঞি রাত্রি যদি পহরেক ভেল।
চতুর্দ্দিক হন্তে এক রোল পড়ি গেল ॥
ঘোরতর শব্দ অতি শুনি সর্ব্বজন।
নিঃশব্দে রহিল যত ভয় পাই মন ॥"

তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, ইহা সামুদ্রিক ঝঞ্ঝার কলরোল নহে, এক অজগর সর্পদলের গর্জ্জন-ধ্বনি। সে নাগদলের মধ্যে একটি সুবিশাল অজগরের মুখে দুইটি অত্যুজ্জ্বল-মণি দেখা যাইতেছিল। রাজপুত্র ও মন্ত্রী-তনয় নাগদলের প্রতি শর নিক্ষেপ করিবার জন্য সৈন্যদিগকে আদেশ দিলেন, আর তাঁহারা উভয়ে মণিধারী সর্পটির প্রতি শর-চালনা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহারা,—

"আষাঢ়ের মেঘ যেন বরিষয়ে নীর।
শরাঘাতে বিঁধিলেক নাগের শরীর ॥"

সর্প মরিল, তাহার ছাল ছাড়াইয়া শুকান হইল এবং দুইটি মণির একটি রাজপুত্র আর একটি মন্ত্রীপুত্র গলায় অক্ষয়-কবচরূপে বাঁধিয়া রাখিলেন।

প্রভাত হইল; নৌ-বহর সিংহলদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিল। এক মাস গমন করিবার পর আর এক চড়ায় তাঁহারা নিশা যাপন করিতে বাধ্য হইলেন। সকলেই নৌকায় শ্রান্ত শরীরে নিদ্রায় নিমগ্ন, এমন সময়,—

"দৈবগতি অলক্ষিতে তুফান হইল।
লবন সমুদ্র মধ্যে তরঙ্গ উঠিল॥
একে ঘোর আর নিশি হইল তুফান।
আর সমুদ্রের জন্তু উঠে তুরমান॥"

এহেন দুর্য্যোগের রাত্রিতে সকলে মৃত্যু অনিবার্য্য দেখিয়া মতিভ্রান্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু—

"পাত্রের তনয় সুত ছিল বুদ্ধিমান।
তুফান দেখিয়া নাও বাঁধে পঞ্চখান॥"

সামুদ্রিক ঝঞ্ঝার প্রকোপে, ভীষণ ও ভয়াবহ জলচর জন্তুর আক্রমণে একে একে সমস্ত নৌকার বহর ছিন্ন হইয়া গেল, পঞ্চ তরণীর নঙ্গর ছিঁড়িল, কে কোথায় কখন অকূল সমুদ্রের জলে ভাসিয়া গেল, তাহার খোঁজই রহিল না। কিন্তু শুভাদৃষ্ট বশতঃ, "সহস্রেক নৌকা মধ্যে পঞ্চ নাও ছিল", এবং দুর্য্যোগ কাটাইয়া তরঙ্গ-হিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে নিশাবসানকালে,

"অলক্ষিতে নাও গিয়া কূলেতে লাগিল।
তাহা দেখি সুতমণি আনন্দিত হৈল॥"

সুত ও বীরভান দৈবযোগে রক্ষা পাইলেন, তাঁহারা তাড়াতাড়ি তীরে উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন সে দেশের নাম সিংহলদ্বীপ, তাহার রাজার নাম রথমণি, রাজকুমারের নাম ইন্দ্রমণি এবং রাজমন্ত্রীর নাম সুরদত্ত। সমস্ত বিষয় জানিয়া লইয়া সুত বীরভানের সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে,

"কতদিন এহি স্থানে রহিব বিশেষ।
সরন্দীপ নগরের করিব উদ্দেশ॥
রথমণি রাজার পুত্রের বিবা কার্যে।
চর নিয়োজিয়া আছে সরন্দীপ রাজ্যে॥
সে সব বিবার চর আসএ যাবৎ।
বৃত্তান্ত বুঝিতে এথা রহিব তাবৎ॥"

সিংহল-রাজপুত্র ইন্দ্রমণির সহিত চন্দ্রাবতীর বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া বীরভানের মন কোন অজ্ঞাত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সুতকে বলিলেন, "পশ্চাতে আমার কার্য্যে হৈব বিড়ম্বন"। সুত রাজপুত্রকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, —"মাভৈঃ, সবুর কর, এবং—

"শুন পারি বুদ্ধি বলে মর্ত্ত্যের মাঝার।
স্বর্গ হস্তে ইন্দ্র অপ্সরা আনিবার॥
পাতালেত অনন্ত নাগের শিরোমণি।
বুদ্ধিবলে আনিয়া দিতে পারি পুনি॥
যদিবা থাকএ মোর কণ্ঠেত জীবন।
চন্দ্রাবতী আনি দিমু তোমা বিদ্যমান॥"

বীরভান সান্ত্বনা লাভ করিলেন ; স্থির হইল যে, চন্দ্রাবতীর প্রকৃত উদ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত নগর মধ্যে বাসা করিয়া তাঁহারা ছদ্মবেশে বাস করিবেন। কিন্তু আপন মাংস যেমন হরিণীর বৈরী হইয়া দাঁড়ায়, তদ্রূপ রাজকুমারের শরীরের রূপ তাঁহার বৈরী হইয়া দাঁড়াইল, কেননা—

"সিংহল দ্বীপেত যে কুমার বীরভান।
নিশি অন্ধকারে যেন ভানু দীপ্তিমান॥
নগরুয়া নারী যত পুরুষ আছএ।
কুমারের রূপ দেখি হেরিতে আসএ॥"

এইরূপে বীরভানের কথা অচিরকাল মধ্যে নগরে ছড়াইয়া পড়িল ; সকলেই তাঁহার বিষয় লইয়া নগরের সর্ব্বত্র আলাপ আলোচনা করিতে লাগিল। ইহাতেও নাগরিকেরা ক্ষান্ত হইল না,—

"একদিন সিংহল দ্বীপের রথমণি।
সভাত আছিল সঙ্গে পুত্র ইন্দুমণি॥
হেনকালে সভামধ্যে যত পৌবজন।
বীরভান কুমারের কহন্তি কথন॥"

রাজা নাগরিকদের মুখে বীরভানের কথা শুনিয়া তাঁহাকে রাজপুরীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সুত তাঁহার বন্ধুকে উত্তমরূপে দিব্য বস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া রাজপুরীতে প্রেরণ করিলেন। রাজপুত্র উত্তম বসন-ভূষণে শোভিত হইয়া নগর উজ্জ্বল করিয়া চলিলেন। তাঁহার এই সজ্জিত মূর্ত্তি এই সুসভ্যযুগে নিশ্চয় উপভোগ করিবার দৃশ্য ; তাঁহার—

"গায়েত কবচ গলে মাণিক্যের হার।
শিরেত ফোটকা দিল অতি শোভাকার॥
কোমরে পোটকা গজ-মুণ্ডার ঝবকা।
কর্ণেত কুণ্ডল যেন চান্দে দিল দেখা॥
হস্তেত বলয়া শোভে অতি মনোহর।
শয্যা বিছাইয়া বৈসে রাজার কুমার॥
মহা দীপ্তিমান রূপ অধিক উলিল।
স্বর্গ হস্তে ইন্দ্র যেন ভূমিতে নামিল॥"

বীরভান রাজপুরীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তারপর কি হইল, পুস্তক খণ্ডিত বলিয়া আমরা জানিতে পারি না। তবে ঘটনাপরম্পরায় যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, বীরভান ঘটনাচক্রে এমন এক স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন, যেখান হইতে তাঁহার আগমন-সংবাদ পাওয়া চন্দ্রাবতীর পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল।

চন্দ্রাবতী বীরভানের সংবাদ পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন, এবং অধীর ঔৎসুক্যে, তাঁহার সখী চিত্রাবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,

"কহ কহ প্রাণসখী কহ সত্য কথা।
কোন মতে বীরভান আসিবেন্ত এথা॥"

চিত্রাবতী স্থির করিলেন যে, চন্দ্রাবতীর এক সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া তাহা ঘুমন্ত বীরভানের বুকে রাখিয়া আসিবেন। বীরভান জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার বুকে প্রিয়তমার আলেখ্য দর্শন করিলে, প্রেমোন্মত্ত হইয়া আপনিই ছুটিয়া আসিতে বাধ্য হইবেন। তিনি চন্দ্রাবতীকে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া সান্ত্বনা দান করিলেন, এবং তাঁহার সখীর এক বিচিত্র আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া বীরভানের উদ্দেশে সত্বর গমন করিলেন। বলা বাহুল্য, চিত্রাবতী তাঁহার সঙ্কল্পানুযায়ী কাজ করিলেন।

এদিকে সখীকে আপন প্রেমিকের উদ্দেশ করিতে আলেখ্যসহ প্রেরণ করিয়া, চন্দ্রাবতীর হৃদয়ে কৌতূহল-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তিনি শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে অতি সাবধানে নির্ব্বিকার চিত্তে বীরভানের কথা ভাবিয়া আকুল। লোকচক্ষুর অন্তরালে মানস-নয়নে

"প্রতিদিন চন্দ্রাবতী কন্যা সুচরিতা।
কুমারের রূপধ্যান করে গুণযুতা ॥"

ঐদিকে বীরভান যথাসময়ে নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেন এবং আপন বক্ষে চন্দ্রাবতীর আলেখ্য দেখিতে পাইলেন। প্রিয়তমার "ভুবনমোহন রূপ চিত্রেত দেখিয়া" তিনি চিত্রটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না; দিনের পর দিন বহিয়া চলিল, তিনি কিছুতেই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন না। সকলেই চিন্তিত, সকলেই বিমর্ষ।

ইতিমধ্যে তিন দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। সুত এই সময়ে অন্যত্র বিচরণ করিতেছিলেন, এবং চন্দ্রাবতীর খোঁজ করিতে করিতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সিংহল-রাজ রথমণির পুত্র ইন্দ্রমণির সহিত চন্দ্রাবতীর পরিণয়ের কথা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। সেই মর্ম্মন্তুদ সংবাদ লইয়া তিনি যখন বীরভানের নিকট ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের হারান-সৈন্যগণের সকলেই সিংহলদ্বীপে গিয়া উঠিয়া পড়ে। সুত যখন বীবভানের নিকট পৌঁছিলেন, তখন বীরভান চন্দ্রাবতীর আলেখ্য দেখিয়া মূর্চ্ছিত।

এইরূপে ঘটনাব সমাবেশ করিয়া, কবি এখানে নাটকীয় রস সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এখানে সত্যই পাঠকের মন নাটকীয় ঔৎসুক্যে ভরপূর হইয়া উঠে, ঘটনা কোনদিকে গড়াইবে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া পাঠক রঙ্গমঞ্চের দর্শকের ন্যায় কৌতূহল-উদ্দীপ্ত-মনে সম্মুখে অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়।

সুত মূর্চ্ছিত বীরভানের পার্শ্বে উপবিষ্ট। তাঁহাদের হারান-সৈন্যগণ একে একে "সব আসি মিলিলেক কুমার গোচর"। মন্ত্রীপুত্র বন্ধুর অবস্থা দর্শনে কাতর। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বীরভানকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে দিতে,

"হস্তীর আম্বারী পরে তুলিয়া কুমারে।
লই গেলা ভদ্রাবতী নগর মাঝারে ॥"

রাজা চন্দ্রসেন পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সংবাদে রাজপুরী আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল, এবং যথাসময়ে রাজা মহাসমারোহে পুত্রকে রাজপুরীতে লইয়া গেলেন। কিন্তু হায়, বীরভান এখনও প্রেমোন্মত্ত, এখনও সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীন, আহার-বিহার করেন না, বা

কাহারও সহিত কথাটি পর্য্যন্ত কহেন না। পুত্রের এহেন অবস্থায় রাজা ও রাণী আবার শোকে আকুল হইয়া পড়িলেন। রাজপুরী আবার বিষাদ-ছায়ায় আবরিত হইল। সুত সমুদ্রযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন-কাল পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনা রাজা ও রাণীর নিকট বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিলেন। রাজা পুত্রের অবস্থা দেখিয়া, চন্দ্রাবতীর উদ্দেশে বীরভানকে আবার সরন্দ্বীপ যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। আবার—

"জালিয়া গোরাব যত ডিঙ্গা মনোহর।
মোমরেজ করিয়া লেপিলা বহুতর॥"

এবারকার সমুদ্রযাত্রায়ও, বীরভান ও সুতের বিপদের অবধি রহিল না। আবার সামুদ্রিক ঝঞ্ঝায় নৌ-বহর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া গেল। এবার সুত জঙ্গম নামক একদেশে গিয়া উঠিলেন, এবং বীরভান গিয়া পড়িলেন মণিপুর রাজ্যে। জঙ্গম রাজের নাম নিশাচর; তাঁহার পরম নামে এক অবিবাহিতা সুন্দরী কন্যা ছিল। ঘটনাচক্রে মন্ত্রীপুত্র সুতের সহিত তাঁহার গন্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া যায় এবং তিনি সুখ-সম্ভোগ না করিয়া প্রিয়বন্ধু বীরভানের সন্ধানে বাহির হন। যাত্রা-কালে তিনি পঞ্চমকে বলিয়া গেলেন যে, বীরভানের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া তাঁহারা পুনর্ম্মিলিত হইবেন।

মণিপুর রাজার নাম মণি; তাঁহার রূপবতী নামে এক অনূঢ়া কন্যা ছিল। মণিপুর রাজ-কুমারী রূপবতীর সহিত চন্দ্রাবতীর পরম প্রীতি ও সখ্য ছিল। তিনি এক রাক্ষসকর্তৃক অপহৃতা হইয়া বহুদিন বন্দী-জীবন যাপন করেন। বীরভান নিজ বাহুবলে রাক্ষসটিকে বধ করিয়া, তাহাকে উদ্ধার করেন এবং ঘটনাচক্রে তাঁহার নিকট হইতে চন্দ্রাবতীর যাবতীয় সংবাদ অবগত হন।

ইতিমধ্যে, সুত "তিলিচ্‌মাত" বা যাদুবিদ্যার বলে, শুক পক্ষীর রূপ ধরিয়া উড়িয়া গিয়া বীরভানের সহিত মিলিত হইলেন। দুই বন্ধু অতঃপর কি করিলেন, পুথী খণ্ডিত বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই। শেষের দুই এক ছিন্ন পত্রে মনে হয়, বীরভানের সহিত চন্দ্রাবতীর বিবাহ হইয়াছিল।

এইরূপ নানা কথার সমাবেশে "চন্দ্রাবতী" কাব্যখানি পরিপূর্ণ। ইহা একটি মৌলিক কাব্য। কবি কোরেশী মাগণ একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি হইলেও, ইহাতে অন্য কোন ভাষার কাব্যের ছায়া পড়ে নাই। মাগণের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে, এহেন স্বাধীন পথে বিচরণ করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মৌলিক কাব্যের একান্তই অভাব। মাগণ ঠাকুরের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এ দীনতা আংশিকভাবে ঘুচিয়াছিল, সন্দেহ নাই। এইজন্য বাঙ্গালা সাহিত্য এই রোসাঙ্গ-প্রবাসী কবির নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে।

"চন্দ্রাবতী" মৌলিক কাব্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবি

তৃতীয় প্রসঙ্গ :—

মহাকবি আলাওল

মহাকবি আলাওল বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। "সতী ময়নার" কবি দৌলত কাজীকে বাদ দিলে, তাঁহার সদৃশ প্রতিভাবান পণ্ডিত লোক এই সমাজে আর দ্বিতীয়টি জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মধ্য-যুগীয় বঙ্গ সাহিত্যে তিনি মধ্যাহ্ন ভাস্করবৎ দেদীপ্যমান। তাঁহার প্রতিভার ভাস্বর দ্যোতিতে সমগ্র বঙ্গসাহিত্য আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি একদিকে মুসলমান জাতির মধ্যে মহাকবির স্বর্ণ-সিংহাসনে সমাসীন, অপর দিকে তাঁহার সমসাময়িক হিন্দু কবিকুলেও তাঁহার আসন অতি উচ্চে। বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি যেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, আরবী ও ফারসী ভাষায়ও তিনি তেমন অসামান্য ব্যুৎপন্ন ছিলেন। একদিকে হিন্দু শাস্ত্র ও সাহিত্যে এবং অপর দিকে মুসলীম শাস্ত্র ও ফারসী সাহিত্যে তাঁহার যেরূপ গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনটি আর কোন মুসলমান কবির মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর কবি প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে অধুনা এমন লোক বিরল, যিনি এই মহাকবির নাম পরিজ্ঞাত নহেন; কিন্তু নাম জানিলেও খুব অল্প লোকই তদীয় প্রকৃত পরিচয় অবগত আছেন। যাঁহার অবির্ভাবে চট্টগ্রাম ধন্য, সেই চট্টগ্রামের অনেকেও তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানেন কিনা, সন্দেহ। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়, আলাওলের জীবনের কোন তথ্য নির্ণয়ের চেষ্টা না করিয়া শুধু এইমাত্র বলিয়াছেন, "আলাওল কবি ফতেয়াবাদ পরগণায় (ফরীদপুর) জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি সমসের কুতুবের একজন সচিবের পুত্র ছিলেন।" সম্ভবতঃ, এই উক্তি দেখিয়াই অনেকে আলাওলকে ফরীদপুরবাসী বলিয়া একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ, তাঁহাদের এইরূপ ধারণার মূলে কোন সত্য নাই; উহা একটা ভিত্তিহীন অনুমান মাত্র। এ কথা আমরা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিলাম।

ভূমিকা

আলাওল স্বরচিত প্রত্যেক গ্রন্থেই আপনার দুঃখময় জীবনের করুণ কাহিনী অল্প বিস্তর লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথাও তিনি আপনার জন্মস্থানের নামোল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ, তখন তিনি দেশে এত প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জন্মস্থানের নামোল্লেখ করা অনাবশ্যক ও বাহুল্য মনে করিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয়, তিনি নিজের পিতার নামটি পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া যান নাই।

আলাওল কি ফরীদপুরবাসী ?

"বহু গ্রন্থ রচিলুং মোহন্ত সব নামে।
মোর বাক্য এথা প্রকাশিল সব ঠামে॥"

কবির "সেকান্দর নামার" এই উক্তি আমাদের অনুমানেরই পোষকতা করিতেছে। তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়া শুধু এই কথাই বারংবার বলিয়াছেন যে, তিনি গৌড়ের প্রধান স্থান ফতেয়াবাদের জালালপুরাধিপতি মজলিস কুতুব নামক জনৈক রাজার অমাত্য-তনয় ছিলেন। এই রাজার পরিচয় প্রসঙ্গে এবং ফতেয়াবাদের বর্ণনায় কবি তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে যে সকল উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে সকল উক্তি একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে, দেখা যাইবে, তাহা হইতে আমরা মজলিস কুতুবের রাজ্যেরই পরিচয় পাই,—তাহাতে আলাওলের জন্মস্থানের কোন পরিচয় পরিব্যক্ত হয় নাই। আমরা দেখিতে পাই, লোকে আত্ম পরিচয় দিতে যাইয়া সাধারণতঃ বংশের প্রধানতম পুরুষের নাম করিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। কবি আলাওল এই স্বাভাবিক রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন,—

"মজলিস কুতুব এই রাজ্যের (ফতেয়াবাদের) ঈশ্বর।
তাহান অমাত্য সুত মুঞি যে পামর॥" (সয়ফুল মুলুক)

অথবা

"রাজ্যেশ্বর মহারাজ কুতুব মহাশয়।
মুঞি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য তনয়॥" (সেকান্দর নামা)—

তিনি রাজার অমাত্য-তনয় ছিলেন, ইহা ভাবিয়া নিশ্চয়ই গর্ব্বানুভব করিতেন। তাই নিজের পরিচয় দিতে গিয়া বারংবার এই কথাই বলিয়াছেন। আবার অমাত্য বলিলে কোন রাজার অমাত্য, তাহাও বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে; তাই আলাওল উক্ত রাজার পরিচয় দিতে গিয়া এতগুলি কথা বলিয়াছেন। স্বীকার করি,—আলাওল-বর্ণিত ফতেয়াবাদ ফরীদপুর জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা ছিল; এখন পদ্মার কুক্ষিগত হওয়ায় তাহার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত বিদ্যমান নাই; এই ফতেয়াবাদে আলাওলের সময়ে মজলিস কুতুব (দীনেশ বাবুর 'সমসের কুতুব' নহে) নামক এক পরাক্রান্ত রাজা রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। কিন্তু এই ফতেয়াবাদ যে আলাওলের জন্মস্থান এ কথা কে বলিল? কবি নিজে এ কথা বলেন নাই, কিংবা ফরীদপুরে অদ্যাপি আলাওলের কোন নাম গন্ধও আবিষ্কৃত হয় নাই; তাঁহার নামহীন পিতা সম্বন্ধেও সেই কথা। এই অবস্থায় মহাকবি আলাওল ফরীদপুরবাসী ছিলেন, লোকের মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা একেবারেই দূর করিয়া দেওয়া উচিত।

তবে আলাওলের জন্মস্থান কোথায়? তাঁহার জন্মস্থান যে চট্টগ্রাম জেলায় ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই; কেননা আলাওল কবিকে আজ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম-বাসী মুসলমানেরাই বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহার সমুদয় কাব্যের প্রাচীন হস্তলিপি ও তাঁহার কীর্ত্তি-চিহ্ন চট্টগ্রামেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা স্থানীয় অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি,—চট্টগ্রাম জেলার হাট হাজারী থানায় "জোবরা" নামক এক গ্রাম আছে। এই গ্রামেই আলাওলের প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ দীর্ঘিকা (যাহা এখনও "আলাওলের দীঘি" নামে পরিচিত) এবং এই বিখ্যাত দীঘির পূর্ব্বধারে চারি কানি পরিমিত স্থানব্যাপী কবির বাস্তুভিটা ও তাহার উত্তর-পূর্ব্ব

চট্টগ্রাম জেলার "জোবরা" গ্রামে আলাওলের জন্ম।

কোণে কবির পাকা কবর অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার অমর স্মৃতি বহন করিতেছে। এখন এই ভিটার অংশ বিশেষে কবির বংশধরগণ দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, আলাওলের পিতা এবং আলাওল এই "জোবরা" গ্রামেরই স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন। খুব সম্ভব এই স্থানেই আলাওলের জন্ম হয়। তাঁহার জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনা আমাদের এই অনুমানের পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে।

আলাওল কোন্ বংশ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত গ্রন্থ হইতে তাহা জানিতে পারা যায় না। অনেকেই তাঁহাকে "সৈয়দ" বংশজাত বলিয়া মনে করেন। তাঁহার অধস্তন পুরুষদের যে বংশ লতিকা পাওয়া যায়, তাহাতে "শাহ্" ও "সৈয়দ" উপাধি দেখিতে পাই। আলাওল শুধু কবি ছিলেন না, "কাদেরীয়া"নামক দরবেশ সম্প্রদায়ের একজন মস্ত দরবেশ ছিলেন বলিয়া ও তাঁহার বংশীয় অনেকের বিশ্বাস। "সেকান্দর নামায়" দেখিতে পাই—

আলাওল কি "সৈয়দ" ও "শাহ" ছিলেন ?

"ছৈয়দ ছউদ সাহা রোসাঙ্গের কাজ। জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজি॥
দয়াল চরিত্র পীর অতুল মহত। কৃপা করি দিলা মোরে কাদেরী খেলাফত॥
যদ্যপি অসক্ত আমি লৈতে সেই ভার। পরশ পরশে তাম্র হএ হেমাকার॥"

কবির এই উক্তি দেখিয়া আমরা তদ্বংশীয়দের উক্ত বিশ্বাসকে অমূলক বলিয়া মনে করিতে পারি না। যদিও তিনি কোথাও দরবেশী দীক্ষাজ্ঞাপক "শাহ" উপাধির ব্যবহার করেন নাই, তদ্বংশীয়গণ সকলেই এই পর্য্যন্ত এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

চট্টগ্রাম জেলার "জোবরা" গ্রামে আলাওলের জন্ম হইলেও, তিনি বা তাঁহার পিতা কেহই এই গ্রামে বেশী দিন কাটাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পিতা ফরীদপুর জেলার ফতেয়াবাদের রাজমন্ত্রী ছিলেন বলিয়া, সেই খানেই তিনি জীবনের অধিকাংশ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। এই সময়ে তাহার পিতা ফরীদপুরেই সপরিবারে বাস করিয়া থাকিবেন। এই অবস্থায়, আলাওল বাল্যকালে ফরীদপুরে পিতৃসন্নিধানে থাকিতেন, এইরূপ অনুমান করা কিছুই অন্যায় হয় না। যৌবনারম্ভে আলাওল উক্ত রাজসরকারের সৈন্য বিভাগে চাকরী গ্রহণ করিয়া তথায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমানের পক্ষে প্রমাণ আছে। কেননা, সৈন্য বিভাগে চাকরী না করিলে পরে পিতার সহিত জলপথে গমন কালে হার্ম্মাদগণের সহিত যুদ্ধ করা ও রোসাঙ্গে গমন করিয়া রোসাঙ্গ-রাজের অশ্বারোহী (রাজ আছোয়ার) সেনা হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। সুতরাং আলাওলের প্রথমিক জীবন ফরীদপুরের ফতেয়াবাদে অতিবাহিত হইয়াছিল, ইহা একরূপ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ফরীদপুরে কবির প্রাথমিক জীবন।

ফরীদপুরে অবস্থান কালে পিতাপুত্র সম্ভবতঃ পারিবারিক কোন কার্য্যবশতঃ জলপথে চট্টগ্রামে আগমন করিতেছিলেন। ইতিহাসের সাক্ষ্যে জানা যায়, তখন শুধু চট্টগ্রাম নহে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গেরই জলপথ-সমূহ পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের দ্বারা সর্ব্বদা উপদ্রুত হইত। এই পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরাই বাঙ্গালা-সাহিত্যে "হার্ম্মাদ" নামে পরিচিত। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনা-সন্নিহিত গ্রামগুলি তাহাদের ভীষণ অত্যাচারে ছারখার হইয়া গিয়াছিল। বৃহৎ বৃহৎ ছিপে আরোহণ করিয়া তাহারা

কবির রোসাঙ্গে গমন।

সমুদ্রের উপকূল ভাগে লুণ্টন করিয়া বেড়াইত। পথে আলাওল ও তৎপিতা ঐসকল হার্ম্মাদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। কবির পিতা ভীষণ যুদ্ধের পর "শহীদ" বা আত্মরক্ষা করিতে গিয়া নিহত হন। আলাওল কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া যান; তিনি রণে আহত হইয়া দৈবচক্রে রোসাঙ্গে উঠিয়া পড়েন এবং পরে রোসাঙ্গ-রাজের দেহরক্ষী অশ্বারোহী সৈন্যদলে চাকরী গ্রহণ করেন (১)। তাঁহার সকল গ্রন্থেই এ বিষয়ে অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়; তবে বেশীর মধ্যে তাঁহার কোন কোন গ্রন্থে শাহ শুজা ঘটিত ঘটনা ও স্বীয় কারাবাসের উল্লেখ আছে।

আলাওল কোন্ রোসাঙ্গ-রাজের রাজত্বকালে অর্থাৎ ঠিক কোন সময়ে রোসাঙ্গ-রাজ্যে রণক্ষত হইয়া উঠিয়া পড়েন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ, তখন রোসাঙ্গে মঘ্ রাজা থদো মিন্তার (Thado Mintar-1645-52 A.D) রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময়ে মাগণ ঠাকুর (আমাদের পূর্ব্বোক্ত কবি কোরেশী মাগণ) নামক একজন মুসলমান, রাজা থদো মিন্তারের (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রীঃ) অমাত্য ছিলেন। কবি আলাওল এই সময়েই রোসাঙ্গে রাজ-অশ্বারোহী-পদে অর্থাৎ আধুনিক যুগের "রাজদেহরক্ষী" (Royal Body Guard) পদে ("রাজ আছোয়ার" পদে) কাজ করিতেছিলেন। কালক্রমে মাগণ ঠাকুর প্রমুখ ওমরাহগণের সহিত কবি পরিচিত হইলেন। এই পরিচয় ক্রমেই প্রগাঢ় প্রণয়ে ঘণীভূত হয়। কবির গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া রোসাঙ্গের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ ও সমাদর করিতে থাকেন। খুব সম্ভব, কবি এই সময়েই তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিয়া মাগণ ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রোসাঙ্গে কবির রাজ-দেহরক্ষী অশ্বারোহীর পদ গ্রহণ।

তিনিও কবিকে পরম সমাদর ও প্রীতি সহকারে "অন্ন বস্ত্র দানে" প্রতিপালন করিতে থাকেন। এই সময়ে মাগণই তাহার সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়স্থল ছিল; এমন কি তিনি কবির "অন্নদাতা ও ভয়ত্রাতা দুই মতে বাপ" ছিলেন। এইরূপে মাগণ ঠাকুরের পরম হৃদ্য ও প্রীতিচ্ছায়ায় আলাওল কয়েক বৎসর একরূপ নিরুদ্বেগে ও সুখেই কালাতিপাত করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সহায় মাগণের আদেশে তিনি দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইহার একটি "পদ্মাবতী" ও দ্বিতীয়টি "সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জমাল"। কিন্তু হায় "সয়ফুল মুলুকের" রচনা সমাপ্ত না হইতেই মাগণ ইহলীলা সাঙ্গ করেন। এহেন বান্ধব ও শরেণ্য জনের বিয়োগে একান্তই শোকবিধুর ও মর্ম্মাহত হইয়া মনোদুঃখে আলাওল লেখনী ত্যাগ করেন, এবং পূর্ব্বারব্ধ অসম্পূর্ণ কাব্যের পরিসমাপ্তি বিধানে নিরস্ত থাকেন।

মাগণ ঠাকুরের আশ্রয়ে কবি আলাওল।

এই শোকাবহ ঘটনার পর, সহসা আরকানে এক ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। হতভাগ্য সুলতান শাহ শুজা তাঁহার ভ্রাতা সম্রাট ঔরঙ্গজেব কর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন। সম্রাটের সেনাপতি মীর জুম্‌লা শুজার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং শুজা অবশেষে রোসাঙ্গ-রাজ

(১) "কার্য্যগতি যাইতে পথে বিধির ঘটন। হার্ম্মাদের নৌকাসঙ্গে হৈল দরশন॥
বহুযুদ্ধ আছিল সহিদ হৈল তাত। রণক্ষতে ভোগযোগে আইলুং এথাত॥
কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার। রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলুম রাজ আছোয়ার॥"
(পদ্মাবতী)

সান্দ থুধর্ম্মার (১৬৬২-১৬৮৪ খ্রীঃ) আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই ঘটনা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দেই সংঘটিত হয়। অতঃপর মীর জুম্‌লার প্ররোচনায় রোসাঙ্গ-রাজ সান্দ থুধর্ম্মা শাহ শুজার সহিত মনোমালিন্যের সৃষ্টি করেন। এই মনোমালিন্য ক্রমেই শত্রুতায় পরিণত হয়। ফলে, হতভাগ্য শাহ শুজা রোসাঙ্গ-রাজ-কোপে পড়িয়া ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সপরিবারে নিহত হইলেন এবং তাঁহার মুসলমান অনুচরগণও প্রভুর দশা প্রাপ্ত হইল।

শুজার আরকানে পলায়ন ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে।

আলাওল বলেন, শাহ শুজা সম্পর্কিত ব্যাপারে মীরজা নামক এক দুরাত্মার অপবাদে রোসাঙ্গের কারাগারে বহুলোক বন্দী হয়। কবি তাহাকে "এজিদ প্রকৃতির দাসীর নন্দন" বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভাবে বোধ হয়, এই পাপাত্মাই উক্ত শোচনীয় অনর্থের মূলীভূত কারণ ছিল। উক্ত "ছার পাপিষ্ঠ" আমাদের কবির ও অপবাদ ঘোষণা করে। তাহাতে তিনিও "বিচার না পাইয়া" কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পাপী কখনও পাপের শাস্তি এড়াইতে পারে না। এই পাপের ফলে পাপিষ্ঠ মীরজাও অবশেষে "শাল অগ্রে উঠিয়া" পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। সুখের বিষয়, আলাওলকে অধিক দিন কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। পঞ্চাশৎ দিন মাত্র "গর্ভবাস সম কর্ম্ম-নিয়োজিত" কারাবাসের পর, তিনি রাহুগ্রস্ত শশীর ন্যায় মুক্তিলাভ করেন। রাজার হস্তে প্রাগুক্তরূপে নির্য্যাতিত হওয়ার পরও আলাওল তৎপ্রতি অভক্তিমান হন নাই। তাঁহার কারা-বাসের পূর্ব্বে রচিত কাব্যের মত পরে রচিত কাব্যের প্রারম্ভেও আলাওল "রোসাঙ্গের তারিফ" নিবদ্ধ করিয়া রোসাঙ্গ-পতির স্তুতিবাদ পূর্ব্বক প্রভু-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কারামুক্তির পরেও আলাওল বহুদিন জীবিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়, এবং শান্তিতে কাব্য লক্ষ্মীর সাধনায় জীবন-নাট্যের শেষাঙ্ক অভিনয়ের মুহূর্ত্ত গণনা করিতেছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বিধাতা তাঁহার দুঃখময় জীবনে সুখ-শান্তি দেন নাই। এই সময়ে নানা দুঃখ, দুর্দ্দশা ও দুর্গতির ভিতর দিয়া তাহার দীর্ঘ কাব্য-সাধনা চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি অদৃষ্টের ক্রূর-পরিহাসে শান্তি ও সুখহীন জীবনই যাপন করিয়াছিলেন। মাগণের মৃত্যুর পর তাঁহার আশ্রয়দাতার অভাব ছিল না। তথাপি দেখা যায়, স্বর্ণ-পিঞ্জরে আবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় পরাধীন জীবনে তাঁহার মর্ম্মন্তুদ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। পরের সাহায্যকে তিনি ভিক্ষা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কেননা সবে ভিক্ষা জীব রক্ষা ক্লেশে দিন যায়" এবং "অসার্থক ভিক্ষা মাত্র যাহার জীবন" এইরূপ খেদোক্তির দ্বারা তিনি স্বীয় দুঃখময় শেষ জীবনের যে বিষাদময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে বঙ্গের অমর কবি মাইকেল মধুসূদনের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

কারাগারে আলাওল।

এ পর্য্যন্ত আলাওলের মোট সাড়ে পাঁচখানি গ্রন্থই আবিষ্কৃত হইয়াছে; যথা— (১) পদ্মাবতী, (২) সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জমাল, (৩) হপ্ত পয়কর, (৪) সেকান্দর নামা ও (৫) তোহ্‌ফা বা তত্ত্বোপদেশ। এই গ্রন্থ পঞ্চক ব্যতীত, তিনি সুকবি দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ রচনা "সতী ময়না" নামক কাব্যের উত্তরাংশও রচনা করিয়া দেন। কিন্তু তিনি "সয়ফুল মুলুকে" লিখিয়াছেন, "রচিলুঁ পুস্তক বহু নানা আলাঝালা"। তাঁহার এই "বহু পুস্তক" কোথায় গেল, অথবা তিনি এই সাড়ে পাঁচকেই "বহু" শব্দের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন কি না, তাহা কে বলিবে? চট্টগ্রামে এখনও

কবির কাব্যাবলী।

বিস্তর প্রাচীন পুথী গৃহস্থের নিভৃত-নিকেতনে প্রচীন জীর্ণ গলিত পত্ররাশির মধ্যে আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় লুক্কায়িত থাকিয়া কীটরাজির আহার জোগাইতেছে। ইহার মধ্যে আলাওলের আরও পুস্তক যে এযাবৎ বাঁচিয়া নাই, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সম্প্রতি তাঁহার রচিত "শিরী খুশরু" নামক আর একখানি গ্রন্থের অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উহা সংগ্রহের জন্য আমরা চেষ্টিত আছি, কিন্তু এযাবৎ সফলকাম হই নাই। এই সকল কাব্য ব্যতিরেকে তিনি বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে ললিত পদ-রচনায়ও তাঁহার অমৃত-নিষ্যন্দিনী লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। আমরা এপর্য্যন্ত তাঁহার রচিত কয়েকটি বৈষ্ণবীয় রূপকে লিখিত পদ আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছি।

কাব্যাবলীর উৎসর্গ।

প্রাচীনকালে দেশের ধনী সম্প্রদায় দুস্থ কবিগণকে অন্ন বস্ত্রে পালন করিতেন, রাজা বা তাঁহাদের আমীর ওমরাহগণ সাহিত্যসেবিগণকে প্রচুর সাহায্য দান করিয়া প্রশান্ত মনে সাহিত্য চর্চ্চার সুবিধা করিয়া দিতেন, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের কবি বড় ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া তাঁহাকে পররাজ্যে পরের আশ্রয়ে দিন যাপন করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি যাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া সাহিত্য সাধনা করিয়াছেন, তাঁহারই গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি কাব্য রোসাঙ্গের কোন-না-কোন অমাত্যের আদেশেই রচিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার আশ্রয় ও আদেশদাতাগণের চরণে তাঁহার কাব্যাবলী উৎসর্গ করিয়া দিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। তাই দেখিতে পাই, মাগণ ঠাকুরের প্রথম আদেশে তিনি "পদ্মাবতী" রচনা করেন; তাঁহার দ্বিতীয় আদেশে তিনি "সয়ফুল মুলুক" রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার রচনা প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হওয়ার পর, হঠাৎ মাগণ পরলোক গমন করেন। মাগণের মৃত্যুর নয় বৎসর পরে, সৈয়দ মুসা নামক অমাত্যের আদেশে "সয়ফুল মুলুকের" অবশিষ্টাংশ রচিত হয়। রোসাঙ্গ-রাজের সমর-সচিব সৈয়দ মোহাম্মদ খানের আদেশে কবি "হপ্ত পয়কর", নবরাজ মজলিস নামধেয় অমাত্যের আদেশে "সেকান্দর নামা" ও অন্যতম অমাত্য শ্রীমন্ত সোলেমানের আদেশে "তোহ্ফা" বা তত্ত্বোপদেশ নামক ইসলাম শাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থখানি রচনা করেন। "হপ্ত পয়করের" আদেষ্টা সৈয়দ মোহাম্মদ খানের আদেশে কবি আলাওল দৌলত কাজীর "সতী ময়নার" উত্তরাংশ রচনা করিয়াছিলেন। যাঁহাদের আদেশে কবি এই কাব্যাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার আশ্রয়দাতা ছিলেন।

কাব্য-রচনার কাল।

এইবার কবি আলাওল তাঁহার কোন্ কাব্য কখন রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বিচার করিয়া দেখিব। এ বিষয়ে কোন অনুমানের আশ্রয় লওয়ার আবশ্যকতা নাই; কেননা কবি তাঁহার অধিকাংশ কাব্যেই রচনার কালজ্ঞাপক সাঙ্কেতিক শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সাঙ্কেতিক শ্লোকগুলি বিচার করিয়া দেখিতেছি যে,—

পদ্মাবতী, ১৬৫১ খ্রীঃ

"পদ্মাবতী"ই আলাওলের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। ইহা কবির সর্ব্বপ্রধান কাব্যও বটে। প্রখ্যাতনামা হিন্দি কবি সাধক মালিক মোহাম্মদ জয়সীর "পদুমাবৎ" নামক কাব্য হইতে আলাওল রোসাঙ্গ-রাজ থদো মিন্তারের (=সাদ উমংদার) রাজত্বকালে তাঁহার "পদ্মাবতী" ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। সুতরাং পদ্মাবতী কাব্যখানি যে ১৬৪৫ হইতে

১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ পর্য্যন্ত পদ্মাবতীর কোন পাণ্ডুলিপিতে রচনার কালজ্ঞাপক কোন সাঙ্কেতিক শ্লোক না পাওয়ায়, পদ্মাবতী রচনার সঠিক সাল জানিবার কোন উপায় ছিল না। সম্প্রতি পদ্মাবতীর কোন একটী প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে আমরা রচনার কালজ্ঞাপক দুইটি পংক্তি লাভ করিয়াছি ; তাহা এইরূপ :—

"যুগ ভুগ তাব রস সন্দ নিত্য দসা।
জে জন তাহাত রত পুরিবেক আসা॥"

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, প্রাচীন ভারতীয় লিপি-বিশারদ পণ্ডিত-প্রবর বাবু হরিদাস পালিত মহাশয় উপর্য্যুক্ত শ্লোকের মধ্য হইতে বহু পরিশ্রমে তারিখ বাহির করিয়া না দিলে, "পদ্মাবতী"—রচনার তারিখ অমিমাংসিতই থাকিত। হরিদাস বাবুর মতে, "যুগ ভুগ তাব রস" একটি তারিখ ; এই তারিখের সংখ্যা অদ্যাবধি অনির্ণীত ; এবং "সন্দ নিত্য দসা" আর একটি তারিখ ; ইহার সংখ্যা ১০১৩। এই ১০১৩ যে মঘী সন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১০১৩ মঘীতে (১০১৩+৬৩৮) ইংরাজী ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ ছিল ; সুতরাং, ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে থদো মিন্তারের রাজত্বকালে (১৬৪৫—১৬৫২ খ্রীঃ) "পদ্মাবতী" রচিত হয়।

"পদ্মাবতীর" পরে আলাওল দৌলত কাজীর 'সতী ময়নার' উত্তরাংশ রচনা করিযাছিলেন। কবি সাঙ্কেতিক শ্লোকে এই রচনার যে তারিখ দিয়াছেন তাহা এইরূপ :

সতী ময়নার উত্তরাংশ, ১৬৫৮।

'মুসলমানী শক সংখ্যা শুন দিয়া মন।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন॥
সিন্ধু শূন্য দেখিআ আপনা দুই দিগে।
সুত কলানিধিরে রাখিলা বাম ভাগে।
মঘদের সনের শুনহ বিবরণ।
যুগে শূন্য মধ্যে যুগ বামে মৃগাঙ্কন॥
শ্রাবণের বসুদিন আশ্বিনের রুদ্রাঙ্গ
তদন্তরে লিখি পুস্তক করিলাম সাঙ্গ॥

ইহা হইতে হিজরী ১০৭০ ও মঘী ১০২০ সাল পাওয়া যায়। হিজরী ১০৭০ সালে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ এবং মঘী ১০২০ সালে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। হিজরী চান্দ্র ও মঘী সৌর বৎসর হওয়ায় উভয় তারিখে কয়েক মাসের প্রভেদ হয়। তাহারই ফলে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এক বৎসরের প্রভেদ বলিয়া মনে হইতেছে ; ফলে তাহা নহে। সুতরাং "সতী ময়নার" উত্তরাংশ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দেই রচিত হইয়াছিল।

"সতী ময়নার" উত্তরাংশ রচনার পরেই আলাওল "সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জমালের" প্রথমাংশ রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যে কবির আত্মকাহিনীমূলক দুইটি ভূমিকা আছে। প্রথম ভূমিকাটি গ্রন্থারম্ভ কালে এবং দ্বিতীয়টি কাব্যের শেষার্দ্ধ রচনার সময় লিখিত হয়। এই কাব্যের প্রথমাংশ মাগণ ঠাকুরের এবং দ্বিতীয়াংশ সৈয়দ মুসার আদেশে মাগণের মৃত্যুর

সয়ফুল মুলুকের প্রথমাংশ, ১৬৫৯

নয় বৎসর পরে রচিত হয় (১)। প্রথম ভূমিকায় শাহ শুজার রোসাঙ্গে গমন বা কবির কারাবাসের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে শাহ শুজার রোসাঙ্গ-গমনের পূর্ব্বে "সয়ফুল মুলুকের" প্রথমাংশ রচিত হয়। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে "সতী ময়নার" উত্তরাংশ রচিত হয়; তখন তিনি নিশ্চয় "সয়ফুল মুলুক" রচনা করেন নাই সুতরাং ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে "সয়ফুল মুলুকের" প্রথমাংশ রচিত হইয়াছিল।

১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে "সয়ফুল মুলুকের" প্রথমাংশ রচনার পরেই, মাগণ ঠাকুর পরলোক গমন করেন কেননা কবি ইহার পরবর্ত্তী আর কোন কাব্যে মাগণ ঠাকুরের উল্লেখ করেন নাই। "হপ্ত পয়করে" কবি যে স্বকীয় জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে শাহ শুজার রোসাঙ্গ-গমনের উল্লেখ স্পষ্টভাবে নাই—ইঙ্গিতে আছে মাত্র। তারপর রোসাঙ্গে যে বিপ্লব ঘটে তাহারও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। রোসাঙ্গ-রাজ সান্দ থুধর্ম্মার প্রশংসা করিতে গিয়া কবি গর্ব্বের সহিত এই মাত্র বলিয়াছেন যে,

হপ্ত পয়কর,—১৬৬০।

"দিল্লীশ্বর বংশ আসি, যাহার শরণে পসি
তার সম কাহার মহিমা।"

ইহা হইতে স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়, কবি যখন "হপ্ত পয়কর" রচনা করিতেছিলেন, তখন শাহ শুজা রোসাঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছিলেন। তখনও শাহ শুজার উপর রোসাঙ্গ-রাজের কোপ-দৃষ্টি পড়ে নাই, তাঁহার হত্যাও সাধিত হয় নাই, বা কবিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েন নাই। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই শাহ শুজা আরকানে পলায়ন করেন এবং শেষ ভাগেই তথায় প্রাণ হারান। সুতরাং আলাওলের "হপ্ত পয়কর" ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল,—সন্দেহ নাই।

"হপ্ত পয়করের" পরেই কবি তোহ্‌ফা বা তত্ত্বোপদেশ নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগেই কবি আলাওল লিখিয়াছেন,—

তোহ্‌ফা-রচনা, ১৬৬৪।

"সপ্ত শত গ্রহ দশ সন বাণাধিক।
রচিলা ইউসুফ গদা তোহফা মাণিক॥
দুই শত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল।
আলিমে পাইল মর্ম্ম আমে না পাইল॥"

ইহা হইতে মূলগ্রন্থের রচনার তারিখ ৭৯৫ হিজরী এবং আলাওলের অনুবাদ আরম্ভের তারিখ ৭৯৫+২৭৮—১০৭৩ হিজরী পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে ইহার শেষে রচনা-সমাপ্তির যে তারিখ রহিয়াছে তাহা এইরূপ :—

পুস্তক সমাপ্ত সর্ব্ব (সংখ্যা) সন মুছলমানি।
রসাসিদ্ধি রামাধির লও পরিমানি॥

১। মহাদেবী মুখ্য পাত্র শ্রীযুত মাগণ। সয়ফুল মুলুক গ্রন্থ করাইল রচন॥
সাঙ্গ না হইতে পুথি পাইল পরলোক। কতকাল মোর মনে আছিল সে শোক॥
তার পাছে শাহ শুজা নৃপকুলেশ্বর। দৈব পরিপাকে আইল রোসাঙ্গ শহর॥
এহি মতে বহি গেল নবম বৎসর।—ইত্যাদি।

পক্ষ সাবানের চতুর্দ্দশ দিন সোমবার।
সমুখে বরাত নিশি শুভযোগ সার॥
তরুণ অরুণ সমে বেলা দুই যাম।
তত্ত্ব উপদেশ এহি পুস্তকের নাম॥
মগদের সন সর্ব্ব বুঝহ নির্ণএ।
রিতু জোগ অভ্র এক বসন্ত সময়॥

উপর্য্যুক্ত শ্লোকগুলি হইতে মুসলমানী অর্থাৎ হিজরী সনের অর্থ আজও আমরা স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। মঘী সনটি ১০২৬ অর্থাৎ ১০২৬+৬৩৮=১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কবি ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে "তোহ্ফা" রচনা আরম্ভ করেন এবং ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার রচনা সমাপ্ত করেন।

কবি আলাওল "তোহ্ফা" রচনার বহুদিন পরে "সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জমালের" শেষাংশ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার শেষাংশ শাহ শুজার রোসাঙ্গে গমনের এবং কবির কারাদণ্ড ভোগের পর বিরচিত হইয়াছিল,—তাহা কবির স্বকীয় উক্তি—দ্বিতীয় ভূমিকা হইতেই স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

সয়ফুল মুলুকের শেষাংশ ১৬৬৯

মাগণ ঠাকুর ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দেই লোকান্তরিত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর নয় বৎসর পরে সয়ফুল মুলুকের শেষাংশ রচিত হইয়াছিল বলিয়া কবি আমাদিগকে জানাইতেছেন। সুতরাং ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে "সয়ফুল মুলুকের" শেষাংশ রচিত হইয়াছিল।

আবিষ্কৃত গ্রন্থের মধ্যে "সেকান্দর নামাই" কবির শেষ রচনা। ইহার ভূমিকায় কবি বলিতেছেন;—

সাহ সুজা রোসাঙ্গে আইল দৈবগতি।
হত বুদ্ধি পাত্র সবে দিল হত মতি॥

সেকান্দর নামার রচনা,— ১৬৭৩।

মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ
পুত্র দারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ

এহিমতে একাদশ অব্দ বহি গেল।
পুনরপি ভাগ্যরবি প্রকাশিত ভেল॥

সুতরাং দেখা যায়, রোসাঙ্গে শাহ শুজা ঘটিত বিপ্লবের একাদশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৬০+১১= ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে কবি আলাওল "সেকান্দর নামা" রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহার রচনা শেষ হইতে দুই বৎসরের কম সময় লাগে নাই। তাই মনে হয়, ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাওল "সেকান্দর নামা" রচনা করেন।

ইহার পর আলাওল আর কোন কাব্য রচনা করেন কি না জানিতে পারা যায় না। হয়ত ইহার পরে তিনি আর কোন কাব্যই রচনা করেন নাই। যদি তাহাই হয়, তবে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই কবি আলাওলের কাব্য প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল, বলিতে হইবে।

আলাওল রাজৈশ্বর্য্যের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু তাঁহার জীবন অসংখ্য দুঃখ, বিষাদ ও দুর্দ্দশার করুণ কাহিনীতে পরিপূর্ণ। যৌবনকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি বেশী দিনের জন্য সুখ-শান্তি ভোগ করিতে পারেন নাই। অদৃষ্টের ক্রুর পরিহাসে যৌবনে জলপথে পিতাসহ স্বদেশ প্রত্যাগমন করিতে গিয়া, তাঁহার যে কপাল ভাঙ্গিয়াছিল, জীবনে তাহা আর জোড়া লইল না। কারাবাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভিক্ষা পর্য্যন্ত যাবতীয় দুঃখ-দুর্দ্দশাই তাহার জীবনে সঞ্চিত ছিল। একটির পর একটি করিয়া, এই দুর্গতিনিচয় তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতে থাকিলেও, সুদীর্ঘ দ্বাবিংশতি বর্ষ ব্যাপিয়া তাঁহার কাব্য-সাধনা অবিরাম গতিতে চলিয়াছিল। কোন সাংসারিক অশান্তিই তাঁহার কাব্য-সাধনার পথে অন্তরায় হইতে পারে নাই। মাগণের মৃত্যুর পর তাঁহার আশ্রয়দাতার অভাব ছিল না; তাঁহাদের আশ্রয়ে তিনি নানা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিধাতা তাহার জীবনে সুখ-শান্তি দেন নাই। কারা-মুক্তির পর তিনি "রাজদায়" ও "রাজকর" লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার পরও---

কবির দুঃখময় জীবন

"মন্দকৃতি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ।
পুত্র দারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ।"

ইত্যাদির সাংসারিক বিপদে ও জঞ্জালে তিনি অশান্তির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অশ্রয়দাতার অভাব ছিল না সত্য, কিন্তু পরের সাহায্যে জীবন যাপনে তাঁহার মনে ধিক্কার আসিয়াছিল। পরের নিকট হইতে স্বীয় জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য সাহায্য গ্রহণ করাকে তিনি ভিক্ষার ন্যায় হীন কাজ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এহেন আত্মগ্লানি অনুভবের ফলে, তাঁহার শেষ জীবন যে কি দুঃখ ও বিষাদময় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখন কল্পনার নেত্রে নিরীক্ষণ করা ব্যতীত আর জানিবার উপায় নাই।

সে যাহা হউক, আলাওলের স্বীয় উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রোসাঙ্গ-রাজের ও অমাত্যগণের আশ্রয়ে থাকিয়া কালাতিপাত করিতে করিতে তিনি রোসাঙ্গেই বৃদ্ধ দশায় উপনীত হইয়াছিলেন এবং তাহার স্ত্রী-পুত্র সবই ছিল। ইহা হইতে মনে হয়, চট্টগ্রাম জেলার জোবরা গ্রামে কবির যে সকল বংশধর বাস করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ করা হয়, তাহা অমূলক গল্প নহে। সম্ভবতঃ, কবি পূর্ব্ববর্ণিত "রাজদায়" হইতে বিমুক্ত হইয়া বৃদ্ধ বয়সে জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিন জীবিত ছিলেন। জোবরা গ্রামে তদীয় বাস্তুভিটা কবর ও দীঘির অস্তিত্ব অন্তিমে তাঁহার জন্মস্থান বাসেরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শেষ জীবনে স্বদেশে প্রত্যাগমন।

আলাওল দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন। তিনি যখন দৈববশে রোসাঙ্গে উঠিয়া পড়েন। তখন তিনি পূর্ণ প্রৌঢ় বয়স্ক বলিয়া মনে হয়, কারণ তিনি এক "পদ্মাবতী" ভিন্ন অন্য প্রায় সব গ্রন্থেই আপনার বার্দ্ধক্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১)। তিনি "পদ্মাবতী" অনুবাদের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রোসাঙ্গে উঠিয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই সময়ে তিনি পূর্ণ প্রৌঢ় বয়স্ক হইলে, তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক ৪৫ বৎসরের অধিক ছিল বলিয়া মনে হয় না। "পদ্মাবতী" অনুবাদের শেষ সময় ১৬৫২

(১) পরপৃষ্ঠায় পাদটীকা দেওয়া গেল।

খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং কবি অনুমানিক (১৬৫২—৪৫) ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কবি "সেকান্দর নামা" রচনার পর, আর বেশী দিন জীবিত এবং রোসাঙ্গে ছিলেন বলিয়া পূর্ব্ব বর্ণিত কারণে মনে হয় না। স্বদেশে আসিয়াও তিনি বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। তিনি স্বদেশে আসিয়া যদি অনুমানিক ৭ বৎসর ও জীবিত থাকেন, তবে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহাকবি আলাওল একজন অসাধারণ কবি ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য নূতন প্রাণ লাভ করিয়াছিল। শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার স্বনামখ্যাত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে আলাওলের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আবশ্যক আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে আর নূতন করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহি না।

কবিত্ব

আলাওলের সমুদয় গ্রন্থই অনুবাদ। প্রচীন হিন্দী কবি মালিক মোহাম্মদ জায়সীর "পদ্মাবৎ" এর বাঙ্গালা অনুবাদ "পদ্মাবতী" ব্যতীত তাঁহার অপর সমস্ত গ্রন্থই ঐ ঐ নামীয় পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদে তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া নিজের অসামান্য প্রতিভার সাহায্যে তাহাতে মৌলিকতার ছাপ দিতে তাঁহার ক্ষমতা অতুলনীয়। এই জন্য তাঁহার গ্রন্থগুলি অনুবাদের গণ্ডী ছাড়াইয়া নূতন সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অনুবাদের ভাষায় কোথাও আড়ষ্টতা নাই, কোথাও শ্রুতিকটুতা নাই,—উহা পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মত স্বচ্ছন্দ সলীল গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। তিনি নিজে বলিয়া না দিলে পাঠক বুঝিতে পারিতেন না যে, তিনি কোন অনুবাদ গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের সমাবেশে তাঁহার রচনা যেন গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে পরিণত হইয়াছে। এ বিষয় আর অধিক আলোচনা করিতে চাহি না; যিনি তাঁহার যে কোন একখানা কাব্য পাঠ করিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। এখন আমরা তাঁহার গ্রন্থগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

অনুবাদে কৃতিত্ব।

আলাওলের কাব্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে আলাওলের কাব্যাদির তারিখ নির্ণয়ের যে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা হইতে

১। পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পাদটীকা:—(ক) "বৃদ্ধকাল হৈল এবে শক্তি ছুটি আসে।
যৌবন কালের সম মন না উল্লাসে॥
(সয়ফুল মুলুক)

(খ) মুঞি আলাওল হীন, দৈববশ অনুদিন
বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকালে।
(তোহফা)

(গ) তান আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি কদাচিত।
যদ্যপিও জরা-জীর্ণ চিন্তাকুল চিত॥"
(হপ্ত পয়কর)

দেখা যাইবে, কবির আবিষ্কৃত পুথীগুলির মধ্যে "পদ্মাবতী"ই সর্ব্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল। ইহার রচনাকাল ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা কবির প্রৌঢ় বয়সের রচনা; সুতরাং ইহা নানাদিক দিয়া উৎকৃষ্ট। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" মাননীয় রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় এই চমৎকার কাব্যখানির সৌন্দর্য্য-সম্পদ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইহা কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

"পদ্মাবতীর" সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

এই একখানি প্রেমমূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহার উপাদানরাজি ভারতবর্ষের খিলজী আমলের ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীন খিলজীর পদ্মিনী-হরণের ঘটনা (সম্প্রতি এ ঘটনা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে,—প্রবাসী, ১৩৩৯ বাং) লইয়াই মূল কাব্য রচিত হয়। শেখ মালিক মোহাম্মদ জায়সী ৭২৯ হিজরীতে অর্থাৎ ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দী ভাষায় "পদুমাবৎ" নামক কাব্যখানি রচনা করেন। প্রাচীন হিন্দী ভাষায় ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মহাকবি আলাওল ইহাকে "পদ্মাবতী" নামে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করেন।

চিতোর-রাজ রত্নসেন প্রথমে নাগমতীকে বিবাহ করিয়া সুখেই দিনাতিবাহিত করিতেছিলেন। রাজা এক শুক পাখী ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই শুকের মুখে সিংহল-রাজ-তনয়া পদ্মাবতীর অপূর্ব্ব-রূপ-লাবণ্যের কথা শুনিয়া রাজাপাট ও নাগমতীকে ছাড়িয়া চিতোর-রাজ রত্নসেন যোগিবেশে ষোল শত রাজকুমারসহ সিংহল যাত্রা করেন। পথে নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া তিনি সিংহলে উপস্থিত হন, এবং অনেক অসাধ্য সাধন করিয়া পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এদিকে নাগমতীর দুঃখের অবধি ছিল না। রাজা তাঁহার কথা ইতিমধ্যে একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

অতঃপর রাজা রত্নসেন এক পক্ষীর মুখে নাগমতীর দুঃখের কথা অবগত হইলেন, এবং পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। পথে এবারও তাঁহার দুঃখের অবধি রহিল না।

রাজার সভায় রাঘব চেতন নামক এক পরম জ্ঞানী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি একদা এক অসম্ভব কার্য্য করায় রাজা তাঁহাকে চিতোর ত্যাগ করিতে আদেশ দেন। দেশত্যাগের সময় পদ্মাবতী ব্রাহ্মণকে তাঁহার হাতের একখানি কঙ্কণ উপহার দিয়াছিলেন। এই কঙ্কণই পরে তাঁহার কাল হইয়াছিল।

অনন্তর রাঘব চেতন দিল্লীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দিল্লীশ্বর সুলতান আলাউদ্দীনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ সুলতানকে পদ্মাবতীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা বলেন এবং তাঁহার নিকট ঐ কঙ্কণের দোসর প্রার্থনা করেন। সুলতান শ্রীজা নামক এক ব্রাহ্মণ দূতকে রাজা রত্নসেনের নিকট প্রেরণ করিয়া পদ্মাবতীকে চাহিয়া পাঠান। রত্নসেন ঘৃণায় সুলতানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ইহাতে সুলতান ক্রোধবশে চিতোর আক্রমণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর যাবৎ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন। রত্নসেন যুদ্ধে বন্দী হইয়া দিল্লীতে নীত ও কারারুদ্ধ হন। সেখানে তাঁহার উপর অকথ্য অত্যাচার চলিতে থাকে।

অনন্তর গোরা ও বদিলা নামক রাজার দুই বিশ্বস্ত অনুচরের কূট বুদ্ধিতে রাজা দিল্লীর কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, এবং স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া পদ্মাবতী সহ কিছুদিন সুখে কাল কাটাইলেন। তারপর দেওপাল নামক এক রাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে রাজা

আহত হইলেন। ইহার সাত মাস পরে রাজা দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার দুই রাণী সহমৃতা হইলেন ইতিমধ্যে দিল্লীশ্বর পুনরায় যুদ্ধসজ্জা করিয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন; কিন্তু সেখানে যাইয়া যখন পদ্মাবতীর চিতাধূম্র দেখিলেন, তখন তাঁহার দুঃখের পরিসীমা রহিল না। তিনি অগত্যা পদ্মাবতীর চিতা প্রণাম করিয়া ক্ষুণ্ণমনে দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। রত্নসেনের দুই অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র পরে সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং সুলতান তাঁহাদের অভিভাবক হইয়াছিলেন।

ইহাই "পদ্মাবতী" কাব্যে বর্ণিত মূল বিষয়। ইহার সহিত আরও নানা গল্প, কথা ও উপগল্প সংযোজিত হইয়া 'পদ্মাবতী"-কাব্যখানিকে এক বিরাট গ্রন্থে পরিণত করিয়াছে। মূল কাব্য পাঠ না করিলে, ইহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ করা অসম্ভব।

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে কবি আলাওল পারসিক মহাকবি নেজামী গজনবীর রচিত "হপ্ত পয়করের" অনুবাদ করেন। "হপ্ত পয়করে" মোট সাতটি "পয়কর" বা গল্প বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থের এই নাম। গ্রন্থের বিষয়বস্তু এইরূপ:—আরব ও আজমের অধিপতি নো'মানের এক পুত্র জন্মে; তাঁহার নাম বাহ্‌রাম। জ্যোতিষীর উপদেশে পুত্রের কল্যাণ-কামনায় নৃপতি পুত্রকে য়মন দেশে বাস করিতে দিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছমনা নামক এক শিল্পী ছিল। সে রাজপুত্রের জন্য একই গৃহে সাতটি "টঙ্গী" (উচ্চ বিলাস-ভবন) নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। এক এক "টঙ্গীর" বর্ণ একরূপ ছিল। রাজপুত্র অস্ত্রে শস্ত্রে পারগ হইয়া হয়-হস্তী আরোহণে সর্ব্বদা মৃগয়ায় ও নৃত্যগীতে দিন কাটাইতেন,—রাজকার্য্যে মন দিতেন না। বাহ্‌রাম পিতৃসন্নিধানে না থাকায়, পিতার মৃত্যুর সময় মন্ত্রী সুযোগ পাইয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। এ কথা শুনিয়া বাহ্‌রাম সসৈন্য আসিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন।

হপ্ত পয়করের গল্প।

তারপর তিনি পার্শ্ববর্ত্তী সাতটি রাজ্য জয় করিয়া সেই সাত রাজ্যের সাতটি অনিন্দ্য সুন্দরী রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করতঃ উক্ত সাত "টঙ্গীতে" বাস করিতে দিলেন। অতঃপর—

আনন্দ উৎসবে রায়, যেদিন যে গৃহে যায়,
সবে পরে সেই বর্ণ বাস॥
নৃত্যগীতে অবশেষে, গোঁয়াইলা কেলি রসে,
শয়ন সময় বাহরাম।
কহে রাজা কন্যা প্রতি, শুন শুন গুণবতী,
কহ এক প্রসঙ্গ উপাম॥
এই মতে সপ্তরাতি, সপ্ত বিজ্ঞা কলাবতী
কহিলেক সপ্ত সুপ্রসঙ্গ।
এই পুস্তকের সূত্র, শুন শুন সাধু পুত্র
রসসিন্ধু অমিয় তরঙ্গ"॥

এইরূপে সপ্ত রাজকন্যার মুখে "হপ্ত পয়করের" অর্থাৎ সপ্ত গল্পের উৎপত্তি; শনিবারের প্রসঙ্গে আরম্ভ ও শুক্রবারের প্রসঙ্গে গ্রন্থের সমাপ্তি। শনিবারের গল্পটাই সবচেয়ে দীর্ঘ। গল্পারম্ভের

পূর্ব্বে আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়ের অবতারণা যে গ্রন্থের মধ্যে আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। গল্পগুলি সবই সুন্দর ও বেশ উপভোগ্য। এই শ্রেণীর আন্যান্য গল্পের মত এই সব গল্পের মূলেও শুধু আনন্দ দান ভিন্ন অন্য কোন মুখ্য উদ্দেশ্য নাই। অবশ্য আনুষঙ্গিকভাবে সমস্ত গল্পেই নানা উপদেশ ও শিক্ষা আছে, সে কথা না বলিলেও চলে।

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে "তোহ্‌ফা" বা তত্ত্বোপদেশ পারসিক কবি ইউসুফ গদার ঐ নামীয় পুস্তক হইতে আলাওল কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদিত হয়। ইহা গল্প গ্রন্থ নহে। ইহা মুসলমানদের ধর্ম্মসম্পর্কীয় উপদেশ ও করণীয় ক্রিয়াকলাপপূর্ণ একটি গ্রন্থ। ধর্ম্মের করণীয় ক্রিয়াকলাপ ও তৎপ্রসঙ্গে নানা তত্ত্বকথা এমন সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা মুদ্রিত হইলে আধুনিক যুগেও মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

তোহ্‌ফা ধর্ম্মগ্রন্থ।

আলাওলের "সেকান্দর নামা" নামক গ্রন্থখানিও, মহাকবি নেজামী গজনবীর রচিত পারস্য "সেকান্দর নামা"র বঙ্গানুবাদ। ফারসী "সেকান্দর নামায়" কবি নেজামী সাহেব আরবী, ফারসী, নছরাণী (ইংরাজী), ইহুদী, ও পহ্‌লবী—এই পাঁচ ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সুতরাং ইহার অনুবাদ যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আলাওল স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য বলে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, এবং এই অনুবাদে তাঁহার খ্যাতিও অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন।

সেকান্দর নামার মূল বস্তু।

এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শাহ সেকান্দরের (Alexander, the Great) দিগ্বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য ইহা যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। রুমরাজ ফয়লকুছের (Philip) আদি নিবাস ইউনান (Ionia) দেশে। তিনি ইস্‌হাক নবীর (Prophet Issac) ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। মকদুমিয়া (Macedonia) দেশে তাঁহার রাজধানী ছিল। শাহ্ সেকান্দর এই ফয়লকুছের পালিত পুত্র। ইউনানী হাকিম (philosopher) নকুমাস্কের পুত্র আরস্তুতালিশ (Aristotle) সেকান্দরের শিক্ষাগুরু ছিলেন। সেকান্দর রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া আরস্তুতালিশকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন ও তাঁহার পরামর্শ মতে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। তিনি জীবনে বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সকল যুদ্ধেই তাঁহার জয়লাভ ঘটে। জঙ্গী রাজার সহিত তাঁহার প্রথম যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি মিসর অধিকার পূর্ব্বক ইস্‌কান্দরিয়া (Alexandria) নগরী স্থাপন করেন। তিনি আয়নার অর্থাৎ দর্পণের সৃষ্টি করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার পিতা পারস্য-রাজ দারাকে (Darius) কর দিতেন। তিনি তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় দারার সঙ্গে তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হয়। বহু যুদ্ধের পর নিজের দুইজন পার্শ্বচরের হস্তে দারা নিহত হন।

সেকান্দর আজম বা পারস্য দেশে গিয়া অগ্নিপূজার স্থান বিনষ্ট করেন ও দারার কন্যা রৌসনককে বিবাহ করিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দেন। তারপর মক্কায় গিয়া তিনি "যেয়ারত" (তীর্থ দর্শন) করেন ও তথা হইতে বরদায় গমন করিয়া তত্রত্য রাজার আনুগত্য গ্রহণ করেন। হিন্দুস্থানে গিয়া রাজাকে পত্র লিখিলে রাজা ভয়ে স্বীয় দুহিতাকে দিয়া সেকান্দরের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন। তারপর কনৌজ বা কাণ্যকুব্জ জয় করতঃ চীন ও রুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়শ্রী লাভ করেন।

অতঃপর "আব্-ই-হায়াত্" (Water of Life) বা মৃতসঞ্জীবনী-সুধা-পানে অমর হইবার উদ্দেশ্যে তিনি "যোল্মাৎ" নামক স্থানে গমন করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। অমরত্ব লাভের উদ্দেশ্যে তিনি আবার "অমর নগর" নামক দেশে গমন করেন। এখানেও তিনি বিফল প্রয়াস হন। তারপর রুমে গমন করিয়া তথায় কিছুদিন অবস্থান করেন। তথা হইতে স্বদেশে গমন করেন, এবং—

"আসিয়া আসন পরে বসিয়া রাজন।
পন্থ পরিশ্রম ক্লেশ কৈল নিবারণ॥
সপ্তখণ্ড পৃথিবীর নৃপতি আজ্ঞাভুক্ত।
নিয়োজিল প্রতি খণ্ডে নায়েব উপযুক্ত॥
ভূপতি সঙ্গতি ছিল যত নৃপদল।
প্রতিজ্ঞায় দড় করি আছিল সকল॥
নৃপতির হস্তে পাই যোগ্য পুরস্কার।
স্বীয় স্বীয় দেশে গেল হরিষ অন্তর॥
বহু ধন রত্ন সবে নিলেক সঙ্গতি।
যার যেই দেশেতে হইল অধিপতি॥
তথা ছাড়ি ইউনানে গেল সেকান্দর।
শুভ ফলাফল সেথা ঘটিল বিস্তর॥"

এখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি। যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনায় পূর্ণ হইলেও, প্রাসঙ্গিকভাবে বহু অমূল্য উপদেশ সন্নিবিষ্ট থাকায়, গ্রন্থখানি অত্যন্তই সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহার ভাষা সর্ব্বত্র মেঘনির্ঘোষবৎ গুরু গম্ভীর।

আলাওলের "সয়ফুল মুলুক-বদীউজ্জমাল্" নামক গ্রন্থখানিও একটি প্রেমমূলক উপাখ্যান কাব্য। ইহাতে মানব-মানবীর প্রেম নাই; আছে মানবাতীত প্রেমের কথা। এই প্রেমের জন্মস্থান মানবীয় জগতে, কিন্তু পরিণতি পরীর রাজ্যে। এই প্রেম দেহগত হইয়াও দেহাতীত, এবং ইহা যেন মানব জগতের সহিত তৎবহির্ভূত জগতের সন্ধিসূত্র। বলা বাহুল্য, ইহাও ফারসী সাহিত্যের অনুবাদ।

সয়ফুল মুলুকের উপাখ্যান।

দেখা যায়, এই কাব্যের নায়ক সয়ফুল মুলুক মিসরের বাদশাহ শাহ ছিপুয়ানের পুত্র ছিলেন; তাঁহার সহিত অমাত্য-পুত্র সঈদ-এর হরিহরাত্মা বন্ধুত্ব ছিল। নায়িকা বদীউজ্জমাল ছিলেন, ইরাণ-বোস্তান নামক পরী-রাজ্যের শাহপাল নামক রাজার অপূর্ব্ব সুন্দরী পরী-রাজকন্যা।

একদা ঘটনাক্রমে সয়ফুল মুলুক পরী-বালা বদীউজ্জমালের একখানা আলেখ্য চিত্রপটে দেখিতে পাইলেন। আলেখ্য দর্শন করিয়া তিনি একেবারেই মুগ্ধ ও আত্মহারা এবং পরে পাগল হইয়া গেলেন। তিনি দিনের পর দিন অচৈতন্য হইয়া থাকিতেন—কেহই তাঁহার মনের কথা খুলিয়া লইতে পারিত না। এই সময়, তাঁহার বন্ধু সঈদ অনেক কষ্টে কুমারের মনের কথা জানিয়া লইয়া

রাজাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। রাজা চিত্রপটধৃত কন্যার উদ্দেশ করিবার জন্য দেশে দেশে চর পাঠাইলেন; কিন্তু তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। রাজা অনন্যোপায় হইয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে একদিন বদীউজ্জমাল কুমারকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেন। কুমার বন্ধু সঈদকে সঙ্গে লইয়া ইরাণ-বোস্তান নামক পরীর রাজ্যে বদীউজ্জমালের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এই যাত্রার পর, কত যে অঘটন ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; প্রসঙ্গক্রমে তাহার বর্ণনা করিতে যাইয়া গ্রন্থখানি এইরূপ প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে। বলাবাহুল্য, পরিশেষে পরীবালা বদীউজ্জমালের সহিত সয়ফুল্ মুলুকের, এবং সঈদ-এর সহিত সরন্দীপ-রাজ-কন্যা মল্লিকার বিবাহ হইয়াছিল।

ইহাই "সয়ফুল মুলুক-বদীউজ্জমাল্" কাব্যের মূল উপাখ্যান। মূল উপাখ্যানের পক্ষে অনাবশ্যকীয় অনেক অবান্তর গল্পের সমাবেশে কাব্যখানি দীর্ঘ হইলেও, ইহাতে আলাওলের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের প্রস্রবণ-ধারা, তাঁহার অপরাপর কাব্যাবলীর ন্যায় সমভাবেই ক্ষরিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

রোসাঙ্গ-রাজসভায়

বাঙ্গালা সাহিত্য-বিকাশের ধারা।

পূর্ব্বাভাস।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর আরকান বা রোসাঙ্গ-রাজসভা বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরনীয় হইয়া থাকিবে। এই শতাব্দীতে বাঙ্গলা সাহিত্যের তিন জন খ্যাতনামা কবি পর পর রোসাঙ্গ-রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই তিন জনের নাম দৌলত কাজী, কোরেশী মাগণ ঠাকুর ও আলাওল। সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্য এই কবিত্রয়ের সাধনায় ধন্য হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বিদেশে বিজাতীয় ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ করিয়া, বঙ্গ ভারতীর এই তিন জন সুসন্তান যে একনিষ্ঠ সাধনায় মগ্ন ছিলেন, তাহাতে যে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সপ্তদশ শতাব্দী-পূর্ব্ব-বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা দুর্ল্লভ। ইঁহারা ন্যূনাধিক এক শতাব্দী ব্যাপিয়া ধীরে ধীরে নানা দেশসঞ্জাত অপূর্ব্ব পুষ্পপুঞ্জে যে বিচিত্র মালিকা বঙ্গ ভারতীর কণ্ঠে দোলাইবার জন্য গাঁথিতেছিলেন, তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যকে আরও একটু মনোরম, আরও একটু হৃদয়গ্রাহী, আরও একটু গৌরবান্বিত করিয়া তুলিল। ইঁহাদের এই সুচারু মালিকা শুধু যে গন্ধে অতুলনীয় ছিল, তেমন নহে, ইহার নানা বিচিত্র ও অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। নিম্নে এবংবিধ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিলাম।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গলা সাহিত্যের স্বরূপ।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য, "সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন হিন্দু যুগের ইতিহাস-পুরাণের প্রচার, প্রাচীন বাঙ্গালার ধর্ম্ম ও বীরগাথা এবং দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, ও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করিয়া গভীর ভাবের আধ্যাত্মিক নীতি কবিতা,—এইগুলি লইয়া ব্যাপৃত ছিল" (১)। তারপর আসিলেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব (১৪৮৪—১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে)। তিনি বঙ্গ ও উৎকল দেশকে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাশ্রয়ী ভগবদ্ভক্তির স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন। তাহার ফলে দেশে যুগান্তর উপস্থিত হইল,—বাঙ্গালাদেশে এক বিরাট বৈষ্ণব-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। এই বিরাট বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-সাধকের জীবনাখ্যায়িকাকে বাদ দিলে, বৈষ্ণবদের "গীতাবলী সাহিত্যই" প্রাধান্য লাভ করে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈষ্ণবদের "গীতাবলী সাহিত্যই" বাঙ্গালা দেশকে পরিপ্লাবিত করিয়া দেয়। এই সময়ে "গীতাবলী বা পদাবলী সাহিত্য" বাঙ্গালায় এমনই প্রাধান্য বিস্তার করে যে, বাঙ্গালা দেশ হইতে অন্যবিধ সাহিত্য-সাধনা একরূপ নির্ব্বাসিত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য

---

(১) বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩৪)—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ১৫৯।

এই গীতাবলী সাহিত্যের বাহিরে প্রভাববিহীন শাক্ত ও শৈব সম্প্রদায়ের দ্বারা চণ্ডী, মনসা, ও ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতির ন্যায় সাম্প্রদায়িক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকে আশ্রয় করিয়া, বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্লাবিত বঙ্গে অন্য এক প্রকার ধর্ম্ম-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের বাহিরে এই ধর্ম্ম-সাহিত্যের কোন স্থান বা প্রভাব ছিল না। কিন্তু "পদাবলী সাহিত্যের" প্রভাব এত বিশাল ও ব্যাপক ছিল যে, গোটা হিন্দু জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, দেব-দেবী ও অবতার-বিদ্বেষী একেশ্বরবাদী মুসলমানগণ ষোড়শ ও শপ্তদশ শতাব্দীতে সুমধুর পদাবলী সাহিত্যের ললিত ঝঙ্কারে বিমুগ্ধ হইয়া এই সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রায় ৬০ ৭০ জন মুসলমান "পদাবলী" লিখকের পদ আমাদের নিকট সংগৃহীত আছে। বৈষ্ণবদের "পদাবলী সাহিত্যের" ব্যাপক প্রভাবের প্রমাণ ইহার বেশী আর কি হইতে পারে। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে গেলে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া বাঙ্গালায় "পদাবলী সাহিত্যেরই" দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও ব্যাপক প্রভাব দৃষ্ট হয়।

রোসাঙ্গে বঙ্গদেশের সাহিত্য সাধনার প্রতিক্রিয়া।

বাঙ্গলা সাহিত্যের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন বাঙ্গালার বাহিরে রোসাঙ্গ-দেশে তিনজন শক্তিশালী ও অমর প্রতিভাবান কবির সাধনায় বাঙ্গলা ভাষার গতি অন্যপথে চালিত হইয়াছিল। এই কবিত্রয়ের মধ্যে দৌলত কাজী ও আলাওল পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না; দৌলত কাজীর কাব্যে "ব্রজবুলী" ভাষার ব্যবহার ও আলাওলের কয়েকটি বৈষ্ণব-রূপকাশ্রিত-পদের আবিষ্কারে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু এহেন বৈষ্ণব-প্রভাব তাঁহাদের কাব্য-সাধনার আদর্শকে খর্ব্ব করিতে পারে নাই। তাঁহাদের উপর যুগ-ধর্ম্মানুযায়ী বৈষ্ণব-প্রভাব ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা একে মুসলমান, দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালাদেশের বাহিরে বাস করিতেছিলেন বলিয়া, বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাব-প্রবাহ তাঁহাদিগকে তৃণবৎ ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই! তাই দেখিতে পাই, বৈষ্ণব-প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াও, তাঁহারা যে ভাবে বঙ্গ সাহিত্যের সাধনা করেন, তাহা যেন বাঙ্গালাদেশের সাহিত্য-ধারার একটি প্রতিক্রিয়া। সত্যই তাহাদের সাহিত্য-সাধনা, বঙ্গালা দেশের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পদাবলী ও ধর্ম্ম-সাহিত্য-সাধনারই একটি প্রতিক্রিয়া বলিয়া আমাদের ধারণা। আমাদের এহেন ধারণা যে একেবারেই অমূলক নহে, তাহা নিম্নের আলোচনা হইতে আরও পরিস্ফুট হইবে।

ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের নির্ব্বাসন

প্রথমতঃ রোসাঙ্গ-রাজসভার এই তিনজন কবি বাঙ্গালা-সাহিত্যের আসর হইতে, ধর্ম্ম-সাহিত্যকে একরূপ নির্ব্বাসিত করিলেন। দৌলত কাজী ও কোরেশী মাগন ত ধর্ম্ম-সাহিত্যকে আমলই দিলেন না, আলাওল বৃদ্ধ বয়সে "তোহ্‌ফা" রচনা করিয়াও এ বিষয়ে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার "তোহ্‌ফা" নামক মুসলমানী সংহিতা গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায়, ধর্ম্ম-গ্রন্থ রচনায়, তাঁহার তেমন আন্তরিকতা ছিল না। ইহা যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও লৌকিক অভিলাষ পূরণের প্রয়াস। যেরূপেই হউক, রোসাঙ্গ-রাজসভায় সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ হইল, তাহা হইতে ধর্ম্ম-সাহিত্য-চর্চ্চা একরূপ নির্ব্বাসিত হইল, এবং তৎস্থলে ধর্ম্ম-গন্ধ-লেশহীন উপাখ্যানমালার আমদানী হইল। কি "সতী-ময়না"

কি "চন্দ্রাবতী", কি "পদ্মাবতী," কি "সয়ফুল মুলুক-বদীউজ্জমান", কি "হপ্ত পয়কর", ও "সেকান্দর নামা" সমস্তই উপাখ্যানমূলক কাব্য; অবশ্য তন্মধ্যে "পদ্মাবতী", কি "সেকান্দর নামা", নামক কয়েকখানি কাব্যকে নিছক কাব্য না বলিয়া ঐতিহাসিক উপাখ্যানমূলক কাব্য বলা সমীচীন। ইতিহাসের আবছায়ায় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য রচিত হইয়াছিল; প্রাচীনতম "ধর্ম্ম মঙ্গল" কাব্যগুলিই তাহার প্রমাণ। কিন্তু আলাওলের "পদ্মাবতী" কি "সেকান্দর নামায়" যেমন ধর্ম্মমূলক কোন উদ্দেশ্য বা বর্ণনা নাই, "ধর্ম্ম মঙ্গল" কাব্যগুলি তেমন নহে। এই গুলিতে ঐতিহাসিক লাউসেনকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধ-দেবতা "ধর্ম্মের" মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে মাত্র। ঐতিহাসিক চরিত্র অঙ্কন করা "ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যগুলির উদ্দেশ্য নহে, ইহাদের উদ্দেশ্য "ধর্ম্ম"দেবতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন; আর আরকান রাজসভার ঐতিহাসিক উপাখ্যানমূলক কাব্যগুলির উদ্দেশ্য, ঐতিহাসিক চরিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিত্তবিনোদক উপাখ্যান বর্ণনা করা। সুতরাং, উভয়বিধ কাব্যে আদর্শের তারতম্য অনেক বেশী ও সম্পূর্ণ পৃথক ছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় রচিত সাহিত্যের আমদানী।

দ্বিতীয়তঃ, রোসাঙ্গ-রাজসভার কবিগণ বঙ্গ ভাষায় ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার (Indian Vernaculars) দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া, মাতৃভাষার পরিপুষ্টি সাধনের প্রতি বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাঁহাদের অনেক পূর্ব্বকাল হইতে পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা কেবল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বা ভাবানুবাদে পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছিল। ইহার ফলে বাঙ্গালা ভাষা আপনার ঘরে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণ প্রভৃতি লাভ করে। রোসাঙ্গ-রাজসভার কবিগণ দেখিলেন যে, মাতৃভাষাকে নানাদিক হইতে উন্নত করিয়া তুলিতে হইলে, শুধু সংস্কৃত ভাষায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। তাই, তাঁহারা ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার ভাল ভাল পুস্তকগুলিকে সরস ভাষায় অনুবাদের ভিতর দিয়া বাঙ্গালায় আমদানী করিতে চেষ্টিত হইলেন। এ বিষয়ে কবি দৌলত কাজীই সকলের অগ্রণী। তিনি ১৬২২ হইতে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার খ্যাতনামা গ্রন্থ "সতী ময়না" প্রণয়ন করিলেন। ইহা গোহারী দেশের ঠেঠ হিন্দীভাষায় রচিত "সাধন" নামক কোন কবির কাব্যের ভাবানুবাদ। কবি তাঁহার কাব্যের ভূমিকায় এ বিষয়ে লিখিয়াছেন;—

শ্রীযুত আসরফ অমাত্য প্রধান ॥

* * *

কহেন্ত সানন্দ চিত্তে প্রসঙ্গ শুনিতে।

* * *

আরবী, ফাছি, নানা তত্ত্ব উপদেশ।
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ ॥
গুজ্রাতী, গোহারী, ঠেঠ, ভাষা বহুতর।
সহজে মহন্ত সভা আনন্দ নিয়র ॥

শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি ॥
শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী ॥
* * *
ঠেঠা চৌপাইয়া দোহা কহিল সাধনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে ॥
দেশী ভাষে কহ তাক পঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে বুঝিয়া যেন পড়এ সানন্দে ॥
তবে কাজী দৌলত বুঝি সে আরতি।
পঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী ॥

এইরূপে কবি কাজী দৌলত যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গেলেন, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী কবিদের মধ্যেও সংক্রামিত হইল। তাই, দেখিতে পাই, আলাওল তাঁহার কবি-জীবন আরম্ভ করিলেন, হিন্দী কবি মালিক মোহাম্মদ জয়সীর "পদুমাবৎ" বাঙ্গালায় "পদ্মাবতী" নামে অনুবাদ করিয়া। আলাওলের এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদিত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা-দেশেও আর একখানি হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদ করা হয়। ইহা কৃষ্ণদাস বাবাজী কর্ত্তৃক অনুবাদিত হিন্দী কবি নাভাজী দাসের "ভক্তমাল"। বাঙ্গালা "ভক্তমালে" অনুবাদের চেয়ে অনুবাদকের স্বাধীন রচনাই অধিক (১)। কাজী দৌলত ও আলাওলের প্রভাবে "ভক্তমাল" অনুবাদিত হইয়াছিল বলিয়া বলা না গেলেও, ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর যুগধর্ম্মের প্রভাবে অনুবাদিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, এবং এই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের অগ্রদূত ছিলেন কবি কাজী দৌলত।

তৃতীয়তঃ, বাঙ্গালা কাব্যে আর একটি বড় আদর্শ স্থাপন করিলেন, রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবি কোরেশী মাগণ। তিনি বাঙ্গালা দেশের বহু প্রচলিত একটি রূপকথাকে তাঁহার "চন্দ্রাবতী" নামক কাব্যে স্থান দিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ধর্ম্ম কথা, দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন এবং সংস্কৃত ও ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার অনুবাদকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াও, সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যাইতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বে বা সমসময়ে কোন বাঙ্গালী কবি সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে অর্থাৎ বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদ দ্বারা উচ্চাঙ্গের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের নিকট জানা নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে "সত্যপীর" বা "সত্যনারায়ণের" কাহিনী, "পদ্মপুরাণ", "মনসার ভাসান" ও "ময়নামতীর গান" প্রভৃতি কাব্যে বাঙ্গালার নিজস্ব উপাদান প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইলেও, এবং ইহাদের অধিকাংশ কাব্য ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হইলেও, ইহাদের রচনার উদ্দেশ্য "চন্দ্রাবতী" রচনার উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু উপাখ্যান ভাগের মধ্য দিয়া পাঠককে নিছক কাব্যামোদ দান করাই, এই কাব্যগুলির উদ্দেশ্য নয়; নানা দেবদেবী ও উপাস্যদেবতার (অবশ্য এই উপাস্য দেবদেবিগণ প্রাচীন বাঙ্গালীরই মানস-সৃষ্টি) মাহাত্ম্য-বর্ণনচ্ছলে বাঙ্গালার উপাদানে এই কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল; আর তৎস্থলে "চন্দ্রাবতী" রচিত হয়, পাঠককে বাঙ্গালার রূপকথার মধ্য দিয়া নিছক কাব্যামোদ

সম্পূর্ণ বঙ্গীয় উপাদানে কাব্য-সৃষ্টি।

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (পঞ্চম সংস্করণ)—দীনেশচন্দ্র সেন—পৃঃ ৩৩৭-৩৩৮।

দান করিবার জন্য। সুতরাং, "চন্দ্রাবতীর" আদর্শ এই কাব্যগুলির আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও নূতন। "ময়মনসিংহ গীতিকা" ও "পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার" কোন কোন গাথা যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; এবং এই গীতিকাব্যগুলি আদর্শের দিকদিয়া "চন্দ্রাবতীর" সহিত তুলিত হইতে পারে। কিন্তু এই গীতিকাগুলিকে এক একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য বলা চলে না। ইহারা বাঙ্গালার মাঠ-বাটের সুন্দর ও মনোরম পুষ্প স্বরূপ। মাঠ-বাট হইতে আহৃত পুষ্পে রচিত মালিকার যে শোভা, বৈশিষ্ট্য ও আদর, তাহা পৃথক পৃথক ফুটন্ত পুষ্প সদৃশ গীথিকাগুলিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু "চন্দ্রাবতীতে" এহেন শোভা ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান। সুতরাং "চন্দ্রাবতীর" সহিত এই গীতিকাগুলির তুলনাও করা যায় না, উচিতও নহে।

চতুর্থতঃ রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবি আলাওলই সর্ব্বপ্রথম বহু সম্প্রসারিত, বিষয়-বৈচিত্র্যপূর্ণ সুমধুর ফারসী সাহিত্যকে অনুবাদের মধ্যদিয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রত্যক্ষভাবে আমদানী করিলেন। ইহাতে পৃথিবীর তাৎকালিক একটি বহু সম্পদশালী, বলিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালীর, নূতন না হইলেও সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিল। আলাওলের পূর্ব্বেও কোন কোন মুসলমান কবি বাঙ্গালা ভাষায় ফারসী সাহিত্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে তাঁহারা প্রধানতঃ ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। আলাওল যাহা করিলেন, তাহা ফারসীর সুকুমার সাহিত্য (Belles-lettres) সংশ্লিষ্ট বিষয়। সুতরাং ইহা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট যে প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার "হপ্ত পয়কর," "সেকান্দর নামা", "সয়ফুল মুলুক-বদীউজ্জমাল" প্রভৃতি কাব্য, ফারসী সাহিত্যের সর্ব্বজন-প্রশংসিত উচ্চদরের সাহিত্য। এই কাব্যগুলির অনুবাদে বাঙ্গালা ভাষা সত্যই সম্পদশালিনী হইয়া উঠে। আলাওল ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবি কর্ত্তৃক এই কাব্যগুলির অনুবাদ হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহাদের স্থানদান করা দুষ্কর হইত।

বাঙ্গালা সাহিত্যে ফারসী সুকুমার সাহিত্যের আমদানী।

পঞ্চমতঃ, আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই,—রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিগণের বিদ্রোহিতা। ইহা যেন পূর্ব্বোক্ত প্রতিক্রিয়ারই বিকাশ। তাঁহারা বঙ্গীয় কবিদের গতানুগতিকপন্থীতা ও পুচ্ছ-গ্রাহীতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে একঘেয়ে' ভাবটা বড়ই প্রবল। সেই এক রামায়ণের সাত শত অনুবাদ সেই এক লাউসেন-কাহিনী লইয়া পুরুষানুক্রমে কবিদের একঘেয়ে' ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা, (সেই এক বেহুলা-লখীন্দর বা ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান আশ্রয়ে চিরাচরিত মনসার ভাসান বা চণ্ডী কাব্য প্রণয়ন), সেই নানা কবির হাতে চৌতিশা-স্তোত্র বা বারমাস্যার একইভাবে বর্ণনা। এই একঘেয়ে' ভাব, আর কবিদের গতানুগতিকতা—যেন বাঙ্গালা দেশের পাহাড়-পর্ব্বতের অভাব-জনিত প্রাকৃতিক একঘেয়েত্বের—সেই মাঠের পর মাঠ, নদী, খাল, সমতল ক্ষেত্র, বাগান, গ্রাম, জঙ্গল লইয়া, বৈচিত্র্যহীন প্রাকৃতিক সংস্থানেরই সাহিত্যিক প্রতিবিম্ব" (১)। আর এই গতানুগতিকতা ও পুচ্ছগ্রাহীতার বিপক্ষে রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের বিদ্রোহিতায় বাঙ্গালা সাহিত্যে যে নূতনত্ব ও

সাহিত্য হইতে এক-ঘেয়েত্বের বিলোপ ও বৈচিত্র্যের আমদানী।

(১) বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা—(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪৮।

বৈচিত্র্য দেখা দিল, তাহা যেন সাগর মেখলা, বনানী কুন্তলা, পর্ব্বত-শীর্ষা, সরিন্মালিনী রোসাঙ্গ ও চট্টলভূমিরই সাহিত্যিক প্রতিবিম্ব। মৌলিকত্বই রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যের জন্য বিষয়বস্তু-নির্ব্বাচনে যে শুধু তাহাদের মৌলিকত্ব ছিল এমন নহে, এমন কি যেখানে দৌলত কাজীর ন্যায় কাব্যে "বারমাস্যার" আমদানী করিয়া গতানুগতিকপন্থীতার অনুসরণ করা হইয়াছে, সেখানেও মৌলিকত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি দৌলত কাজীর কবিত্বের কথা বলিতে গিয়া, তাঁহার "বারমাসী"র মৌলিকত্ব সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। মাগণ ঠাকুরের "চন্দ্রাবতী" কাব্যখানি সকল বিষয়ে সর্ব্বদিক দিয়াই মৌলিক। কবি আলাওল অনুবাদ ব্যতীত অন্য বিষয়ে (অবশ্য ধর্ম্মগ্রন্থ "তোঁহ্ফার" কথা বাদ দিয়া) হস্তক্ষেপ না করিলেও, অনুবাদিতব্য গ্রন্থ নির্ব্বাচনে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূলানুসারী অনুবাদের চরমোৎকর্ষে যে অপূর্ব্ব মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শুধু আলাওলেই সম্ভবে।

ষষ্ঠতঃ, রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন আদর্শকে বদলাইয়া দিয়া, ইহার স্রোতকে যে মুখে প্রবাহিত করিলেন, তাহা হইল—সাহিত্যে মানবীয় প্রেমের মাহাত্ম্য স্বীকার।

সাহিত্যে নূতন আদর্শ মানবীয় প্রেম।

সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালার কোন কবি নিছক মানবীয় প্রেমের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন নাই। ষোড়শ শতকের শেষার্দ্ধ হইতে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবেরা বাঙ্গালা দেশকে যে প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিলেন, এবং তাহার ফলে যে বিরাট "পদাবলী সাহিত্য" গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা মানবীয় প্রেমের রূপকে ভগবৎ-প্রেম মাত্র। দেব-প্রেম, গুরু-প্রেম বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন কাল হইতে ছিল; কিন্তু বঙ্গীয় কবিগণ সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নিছক মানবীয় প্রেমকে স্বীকার করিয়া, তাহাকে কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে মানিয়া লইয়া, কোন বিরাট কাব্য লিখেন নাই। দৌলত কাজী এ বিষয়ে অগ্রণী; তাঁহার "সতী ময়না" অনুবাদ অর্থাৎ ভাবানুবাদ হইলেও তাঁহার কাব্যের ভিত্তি বা কেন্দ্র মানবীয় প্রেম। তাঁহার পরবর্ত্তী কবি মাগণ "চন্দ্রাবতী"তে জোরে স্বাধীনভাবে মানবীয় প্রেমের মাহাত্ম্য ও বিজয় ঘোষণা করিলেন; আলাওলে ত কথাই নাই। বাস্তবিকই, সৌজন্য, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি যত গুণ মানুষের মধ্যে আছে, তন্মধ্যে প্রেমই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ। ইহার দুর্দ্দম প্রভাব মানব মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকিবেন। মানব-জীবনের এমন ক্ষমতাশালী গুণটিকে কেন্দ্র করিয়া কাব্য-রচনা করিবার পরিকল্পনা, রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিগণই বাঙ্গালা ভাষাকে সর্ব্বপ্রথম দান করিলেন। অবশ্য ফারসী ও হিন্দী সাহিত্যের সংশ্রবে তাঁহাদের এ বিষয়ে চক্ষু ফুটে, সন্দেহ নাই। স্বীকার করি, এদেশের রূপকথায় বা গীতিকা-গুলিতে মানব-প্রেমের মাহাত্ম্য ও ক্ষমতা বিঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা পল্লীর শান্ত-স্নিগ্ধ-ক্রোড় ত্যাগ করিয়া, সাহিত্যের আসরে তখনও স্থান পায় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙ্গালায় উপন্যাস রচিত হইবার পূর্ব্বে, মানুষের প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্য-রচনা করিবার আদর্শ সর্ব্বপ্রথম রোসাঙ্গ হইতে এদেশে আগমন করে।

সপ্তমতঃ দেখিতে পাই, বাঙ্গলা ভাষার পরিচ্ছদ-পবিবর্ত্তনে রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিগণের হাত।

ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা পল্লীর সরল শিশুটির মত মোটা ভাত-কাপড়েই দিনাতিপাত করিতেছিল ; পল্লী-জনোচিত সরল ভাব ও প্রাকৃতিক ভাবাপন্ন শব্দ-সম্পদই তাহার প্রধান উপজীব্য ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে দৌলত কাজী বা আলাওল প্রমুখ পণ্ডিত কবিদের হাতে পড়িয়া প্রাকৃতিক ভাবাপন্ন শব্দ সম্পদ ও পল্লীর সরল ভাব দ্রুত বিসর্জ্জিত হইল। এবং তৎস্থলে, "অলি, পিক, ভুজঙ্গ, চামর, জলধর। শ্যামতা সৌষ্ঠবে নহে তার সমস্বর॥"—প্রভৃতির ন্যায় পাণ্ডিত্যমূলক ভাষা ও ভাবের সমাবেশ হইল। এই রূপে, বাংলা-ভাষা অচিরেই শব্দ-সম্পাদে, ছন্দ-বৈভবে, পাণ্ডিত্য-গর্ব্বে ও ভাষার ঝঙ্কারে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পাণ্ডিত্য মূলক ভাষার আমদানী

রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিগণ বাঙ্গালা সাহিত্যকে কি কি বিষয় দান করিয়াছিলেন, এখন তাহা পরিষ্কারভাবে দেখা যাইতেছে। তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যকে যে অপূর্ব্ব সম্পদ দান করিলেন, তাহাতে এ দেশের সাহিত্য শুধু একটু সম্মুখে অগ্রসর হইল না। বরং নানা দিক হইতে পরিপুষ্ট ও নানা বিষয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। "মোটের উপর ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল অতি অল্প তিন চারিটি বিষয় লইয়া এই সাহিত্যের পুঁজিপাটা। ইহার তুলনায় প্রাচীন হিন্দী বা তামিল সাহিত্যের প্রসার খুব বেশী, এবং সেই যুগের ফার্সী, আরবী, ইতালিয়, ফরাসী ইংরেজী প্রভৃতি পশ্চিমের ভাষাগুলির এবং চীনা ভাষার সাহিত্যের প্রসার ও বিষয় বৈচিত্র্য আরও অনেক বেশী" (১) রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিগণ এহেন বাঙ্গলা সাহিত্যকে নূতন আদর্শ দান করিলেন, নানা ভাবে সম্প্রসারিত করিলেন, বিষয়-বৈচিত্র্যে পূর্ণ করিয়া দিলেন, ভারতীয় উন্নততর হিন্দী ভাষার সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন, এবং নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সুমধুর ফারসী সাহিত্যের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচয় ঘটাইয়া দিলেন। ১৬২২ হইতে ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ মাত্র ছয়ষট্টি বৎসরের মধ্যে, রোসাঙ্গ-রাজসভায় বাঙ্গলা ভাষাও সাহিত্যের যে সর্ব্বোতোমুখী বিকাশ সাধিত হয়, তাহার তুলনা বাঙ্গালা ভাষার আপন গৃহে মিলে না।

সংক্ষিপ্ত পূর্য্যালোচনা

রোসাঙ্গ-রাজসভায় সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এহেন বিকাশ ও বৈচিত্র্য লাভে, বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষেও গৌরব করিবার বিষয় আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে, হুসেন শাহ, নসরত শাহ, পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ প্রমুখ গৌড়ের স্বাধীন মুসলমান সুলতান ও তাঁহাদের আমীর ওমরাহদের উৎসাহে বাঙ্গালা সাহিত্য দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের সে অপোগণ্ড শৈশবযুগে মুসলমান সুলতান ও আমীরগণ ইহাকে রাজানুগ্রহ দান না করিয়া গলা টিপিয়া

বাঙ্গলা সাহিত্য ও মুসলমান

(১) বাঙ্গালা ভাষা-তত্ত্বের ভূমিকা (পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)
শ্রীসুনীতি কুমার চাট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ১৪৮।

মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিলে, ইহা যে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইত, তাহা সঠিকভাবে বলা না গেলেও মুসলমান রাজানুগ্রহে তখন ইহার দ্রুত বর্দ্ধন ও বিকাশে সাহায্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে আসিয়াও আবার আমরা রোসাঙ্গ-রাজসভায় অনুরূপ ব্যাপারই ঘটিতে দেখি। রোসাঙ্গ রাজসভাসদ "লস্কর উজীর" (=সমর সচিব) আশরফ খান, মুখ্যপাত্র (প্রধান মন্ত্রী) মাগণ ঠাকুর নবরাজ মজলিশ, সমর সচিব সোলেমান, পাত্র মুসা প্রমুখ মুসলমান আমীর ওমরাহগণ সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে আমল না দিলে, এই সাহিত্যের দীনতা সহসা ঘুচিত না। এই সকল ব্যাপার দেখিলে মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে বাঙ্গালার মুসলমানদের যত খানি হাত রহিয়াছে, হিন্দুদের ততখানি নহে। এদেশের হিন্দুগণ বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের জন্মদাতা বটে; কিন্তু তাহার আশৈশব লালন, পালন, ও রক্ষাকর্ত্তা বাঙ্গালার মুসলমান। স্বীকার করি, মুসলমান না হইলে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য মনোরম বন-ফুলের ন্যায় পল্লীর কৃষক কণ্ঠেই ফুটিয়া উঠিত ও বিলীন হইত, কিন্তু তাহা জগতকে মুগ্ধ করিবার জন্য উপবনের মুখ দেখিতে পাইত না, বা ভদ্র সমাজে সমাদৃত হইত না। এইরূপে ঘরে-বাহিরে মুসলমানেরা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে ক্রমান্বয়ে নানাভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবির বিবরণ সম্প্রতি "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়," (১৩৪১ বাং) প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার নাম সৈয়দ সুলতান। এত প্রাচীনকাল হইতে মুসলমানেরা প্রত্যক্ষ ভাবে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল,—ইহা কি মুসলমানদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাব

পরবর্ত্তী ও সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যে রোসাঙ্গ-রাজসভার প্রভাব অসাধারণ। সাহিত্যে যখন কোন নূতন আদর্শ আসিয়া দেখা দেয়, তখন তাহা সাহিত্যের নানা স্তরে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিগণ সাহিত্যে যে সকল নূতন আদর্শ লইয়া আসিলেন, তাহাও তাৎকালিক এবং তৎপরবর্ত্তী বাঙ্গালা সাহিত্যে জোরে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য, পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালা সাহিত্যে এ প্রভাব গিয়া পৌঁছে নাই। পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে, বিশেষতঃ চট্টগ্রামের সর্ব্বত্র হইতে রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের পুস্তকের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ব্ববঙ্গে রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল।

পূর্ব্ববঙ্গেই রোসাঙ্গ রাজসভা কবিদের প্রভাব।

রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের গৌণ প্রভাব বহু বিস্তৃত। আলাওলকে ভারতচন্দ্রীয় যুগের পথ প্রদর্শক বলিয়া, স্বয়ং ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাবে যে শক্তিশালী বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এ অধ্যায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, রোসাঙ্গে যখন পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত আদর্শ লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে থাকে, তখন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে অন্যান্য প্রাচীন আদর্শগুলি পরিত্যক্ত হয় নাই। তাই দেখিতে পাই, এই যুগে একই ব্যক্তির হাতে প্রাচীন ও নূতন আদর্শে সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে; যিনি ধর্ম্ম-সাহিত্য ও পদাবলী সাহিত্য লিখিতেছেন, তিনি আবার উপাখ্যান ও প্রেমমূলক কাব্য রচনায়ও মনোনিবেশ করিয়াছেন।

প্রাচীন আদর্শ একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই।

রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের সমসাময়িক বা একটু পরবর্ত্তী কবিদের বিষয়ই এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ইহাদের মধ্যে অনেকের প্রতিভা দৌলত কাজী কি আলাওলের সমকক্ষ না হইলেও, কয়েকজন কবির প্রতিভা নিতান্তই কম ছিল না। কিন্তু সকলের উপরেই, রোসাঙ্গ-রাজসভার সাধারণ প্রভাব (ইহাকে যুগ-ধর্ম্মের প্রভাবও বলা যাইতে পারে) সুস্পষ্ট। আবার অনেকেই শুধু রোসাঙ্গ-রাজসভার আদর্শে অনুপ্রাণিত নহে, দৌলত কাজী কি আলাওলের ভাব ও ভাষা শুদ্ধ চুরি করিয়া কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এ সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনার স্থান ইহা নহে, এস্থলে তাহা আলোচিত হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। তবে আলোচনা প্রসঙ্গে আবশ্যক মত স্থানে এ সকল অপ্রীতিকর কথাবও উল্লেখ করিতে হইবে।

এই অধ্যায়ের পরিসর।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সাধারণতঃ মুসলমানদের উপরেই রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাব দৃষ্ট হয়।

এই যুগের কোন কোন কাব্যের পাণ্ডুলিপি হিন্দু লিপিকরের দ্বারা লিখিত ; ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যগুলি হিন্দুদিগের নিকটও সমাদর লাভ করিতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাব্যগুলির আদর্শে খুব অল্প হিন্দুই নূতন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের সংগৃহীত ন্যূনাধিক ৩০০ তিন শত হিন্দু পুথীর মধ্যে মাত্র কয়েক জনকেই নূতন আদর্শ গ্রহণ করিয়া কাব্য রচনা করিতে দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি? মুসলমান কবিদের হাতেই বাঙ্গালা কাব্য এই যুগে নূতন আদর্শ লাভ করিয়াছিল। তাই কি তাঁহাদের স্থাপিত আদর্শ হিন্দু কবিদের নিকট অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছিল? ধর্ম্মের গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতা কি সাহিত্যেও সংক্রামিত হইয়া উঠে? যদি সত্যই তাহাই হয়, তবে দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়?

হিন্দুকবি ও রোসাঙ্গ-রাজসভা।

সে যাহা হউক, রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাবে, পূর্ব্ববঙ্গে যে সকল কবি জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই তারিখ পাওয়া যায় না। তবে ভাষা, ভাব ও কাব্য বিচার করিয়া যাঁহাদিগকে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া আমরা মনে করি, তাঁহাদের কথাই এই অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হইল। যাঁহাদের তারিখ এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই, তাঁহাদিগকে কি কি কারণে এ অধ্যায়ভুক্ত করা হইল, সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে গেলে, ও এক একটি করিয়া কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, অধ্যায়টি অযথা বাগাড়ম্বরে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। সাধারণভাবে এইটুকু আমরা বলিতে পারি যে, যাঁহারা ইহাদের কাব্যগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন, এই অধ্যায়ভুক্ত যাবতীয় কবি সপ্তদশ শতাব্দীর লক্ষণাক্রান্ত ; তাই তাঁহাদের কাব্যগুলিকে এই অধ্যায়ভুক্ত করিতে হয়। এই সমুদয় কবির মধ্যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণই প্রধান :—

এই অধ্যায়ভুক্ত কবিদের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর যাবতীয় লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(ক) মরদন্ :— রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাবে যে সকল কবির আবির্ভাব হয়, তন্মধ্যে কবি মরদনই সবচেয়ে প্রাচীন ব্যক্তি। ইনি রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের ন্যায় প্রতিভাবান পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না সত্য, কিন্তু তিনি নিতান্তই হীন ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহার কাব্যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাচীনতম বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়; এই দিক দিয়া ইহার স্থান অনেক উচ্চে। বিশেষতঃ ইহার রচনা মাগণ ঠাকুরের রচনা হইতে বিশেষ নিকৃষ্ট নহে।

(ক) মরদন্।

সে যাহা হউক, ইনি নিজে তেমন কীর্ত্তিমান পুরুষ না হইলেও, ইনি অমর কবি দৌলত কাজীর সমসাময়িক ছিলেন। রোসাঙ্গ-রাজ থিরী থুধর্ম্মার রাজত্ব কালে (১৬২১—১৬৩৮ খ্রীঃ) ইনি আবির্ভূত হন। তিনি তাঁহার কাব্যের ভূমিকায় থিরী থুধর্ম্মার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"ভোবন বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গ নগরি। রাবনের জেহেন কক (কণক?) লঙ্কাপুরি॥
শ্রিশ্রি সুধর্ম্ম সাহা তথাত ইস্বর। কামদেব পর ·· পরম সোন্দর॥
ছত্র অ ধবল গজ লোক অধিপতি। ধনঞ্জয় সমস্বর বলবন্ত অতি॥
ব্রিঅস্পতি সম বুদ্ধি, দানে কর্ণ সম। রণে মহাবীর সে যে বিসাল বিক্রম॥"

দুঃখের বিষয় কবি মরদন্ তাঁহার কাব্যের ভূমিকায় নিজের কোন জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। তবে প্রসঙ্গক্রমে তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন,--

"সে রাজ্যেত (=রোসাঙ্গে) 'ক কাঞ্চি নামে পুরি। মোহমিন মুসলমান বৈসে সে নগরি॥
আলিম মলনা বৈসে কিতাব কারণ। কায়স্থগণ বৈসে সব সেক……পরণ॥
ব্রাহ্মন সজ্জন তথাত বৈসএ পণ্ডিত। নানা কাব্য রস কথা কহে এ পুরিত॥"

ইহা হইতে মনে হয়, কবি রোসাঙ্গের "কাঞ্চি" নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করুন বা না করুন, অন্ততঃ তথায় প্রবাসী ছিলেন। এই নগরেই তিনি কাব্য-সাধনায় লিপ্ত ছিলেন, সন্দেহ নাই। যেস্থানে হিন্দু-মুসলমান (আলিম, মৌলানা, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি) সকলেই নানা কাব্য আলোচনা করিতেন, তথায় কবি কাব্য-প্রণয়ন করিয়াছিলেন,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। কবি তাহার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কেবল এইটুকুই বলিয়াছেন,--

"ইব্রাহিম খলিল পির রূপে পঞ্চবান
হীন মর্দ্দনে কহে কামাল বাখান॥"

আমাদের নিকট এই কবির একখানি কাব্যের কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার কয়খানিই খণ্ডিত। সর্ব্বপ্রাচীন পাণ্ডুলিপিখানি দেড় শত বৎসরের কম প্রাচীন নহে। পাণ্ডুলিপি কয়খানির কোনটি হইতেই, পুস্তকের কি নাম ছিল, তাহা জানা যায় না। তবে পুস্তক পাঠ করিয়া মনে হয়, পুথীখানির নাম "নছিরা নামা" ছিল। একটী পাণ্ডুলিপির এক স্থানের দুই পংক্তি এইরূপ : —

"……নামা পঞ্চালিকা শুণ নরগণ।
পূর্ব্ব……ম্বাছিলেক হেন বিবরণ॥"—

এই পংক্তি দুইটির যথাযথ পাঠোদ্ধার না হইলেও, প্রথম পংক্তিতে "নামা" কথাটি দেখিয়া, পুথীর বিষয়-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মনে হয়, ইহার শূন্যস্থলে "নছিরা" কথাটি ছিল। সে যাহা হউক, আমরা কবি মরদনের পুথীখানিকে আপাততঃ "নছিরা নামা" নামেই অভিহিত করিব।

কবি মরদনের "নছিরা নামা" খানি খণ্ডিত হইলেও, ইহার প্রতিপাদ্য ও মূল বিষয়বস্তু জানিয়া লইতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না। কবি লিখিয়াছেন, -দক্ষিণদিকের "আসি" নামক কোন রাজ্যে নুরুদ্দীন নামক কোন রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে আবদুল করীম ও আবদুল নবী নামক দুই ধনবান সাধু অর্থাৎ বণিক বাস করিত। দুই জনের মধ্যে পাপালা অত্যন্ত মিতালি ছিল। একদা বণিকদ্বয় মৃগয়া করিতে গিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি তাহাদের একজনের পুত্র ও অপরের কন্যা জন্মে, তাহারা তাহাদের পুত্র কন্যাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করাইয়া পরস্পর বৈবাহিক হইবেন। যথাকালে নছিরা বিবি নামক আবদুল করীমের এক কন্যা এবং আবদুল ছবীর নামক আবদুল নবীর এক পুত্র জন্মে। ইহাদের বিবাহযোগ্য বয়সে, আবদুল করীম বাণিজ্যে গিয়া দৈবদশায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়ে। আবদুল নবী ইতিমধ্যে দরিদ্র আবদুল করীমের প্রতি ঘৃণা বশতঃ নছিরা বিবির সহিত স্বীয় পুত্র আবদুল ছবীরের বিবাহ না দিয়া, আবদুল গণী নামক অন্য এক

সদাগরের কন্যার সঙ্গে তাহার পুত্রের বিবাহ স্থির করিল। এ ব্যাপারে আবদুল করীম মর্ম্মাহত হইয়া প্রাচীন প্রতিজ্ঞার কথা তাহার পত্নীকে খুলিয়া বলিলে, তিনি তাঁহার বন্ধুকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে উপদেশ দিলেন। আবদুল করীম তাহাই করিল। আবদুল নবী ধনমদে বিভোর হইয়া দরিদ্র আবদুল করিমকে ভৎর্সনা ও অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। দরিদ্র আবদুল করীমের পত্নী স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া,—"অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়"—এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য কয়েকটি গল্পের অবতারণা করেন। বলাবাহুল্য, পরে আবদুল করীমের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তখন কন্যা নছিরা বীবীর সহিত আবদুল নবীর পুত্রের বিবাহ হইল।

কবি মরদনের "নছিরা নামা" কাব্যখানি একটি মৌলিক গ্রন্থ। "পূর্ব্ব......যাছিলেক হেন বিবরণ",—এই পংক্তি হইতে জানা যায়, কবি তাঁহার কাব্যে যে গল্পটি বা গল্পগুলি বলিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল; কবি এই গল্পগুলিকে কেবল কাব্যে রূপ দিয়াছেন। এইরূপে সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কেহ কাব্য লিখেন নাই। কোরেশী মাগণের "চন্দ্রাবতী" ও মৌলিক কাব্য, কিন্তু তাহা "নছিরা নামার" বহু পরে লিখিত হইয়াছিল। এইদিক হইতে, বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে "নছিরা নামা" সর্ব্বোচ্চে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত নয়।

(খ) শমশের আলীঃ ইহার লিখিত কাব্যের নাম "রিজওয়ান শাহ" এই কাব্যের কোন হস্তলিখিত পুথী আমাদের নিকট নাই। বটতলার মুদ্রিত পুথীই আমাদের আদর্শ। হতভাগা বটতলার মুদ্রাকরের কারসাজীতে এই সুন্দর পুথীখানির যে চরম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি ইহার উপর নির্ভর না করিয়া উপায় নাই।

(খ) শমশের আলী।

গ্রন্থখানির তিন-চতুর্থাংশ কবি শমশের আলির রচিত। ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবার পূর্ব্বে কবি স্বর্গলাভ করেন (১)। অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশে "আছলম", "মোহাম্মদ হাকিম আলী" ও "ছেদমত আলীর" ভণিতা দেখা যায়। সুতরাং, কে ইহাকে সমাপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা ঠিকভাবে বলিবার উপায় নাই।

চট্টগ্রামের প্রাচীন হাটহাজারী (বর্ত্তমান রাউজান) থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে কবি শমশের আলীর জন্ম হয় (২)। এই সুলতানপুর গ্রামেই কবি দৌলত কাজী ও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যতদূর দেখা যায়, কবি শমশের আলী দৌলত কাজীর একটু পরবর্ত্তী কবি ছিলেন। শমশের আলী তাঁহার "রিজওয়ান শাহ" কাব্যে "চন্দ্রাবতীর"র রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া এ বিষয়ে একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন,—

এই স্থানে যোগ্য হয় রূপের বর্ণনা। কিন্তু আমি শক্তিহীন কি করি রচনা।
উরদু বহিতে ধিক যোগ্য ব্যাখ্যা নাই। ফারসী গ্রহন্ত ব্যাখ্যা অখণ্ড না পাই॥

---

(১) মহাকবি সমসের আলি স্বর্গে হৈল বাস। কাব্যেতে চতুর ছিল দ্বিতীয় সে ব্যাস।
খণ্ড কাব্য পুস্তক পুরিতে মোর আশ। পাছে হীন আছলমে হইয়া উল্লাস॥ (রিজওয়ান শাহা)

(২) জিলে চট্টগ্রাম মধ্যে হাটজারি থানা। সুলতানপুর মৌজা বলে সর্ব্বজনা।
সে সাকিনে শমশের মহা কবিবর। প্রথম প্রসঙ্গ কাব্য রিজওয়ান ঈশ্বর॥ (রিজওয়ান শাহা)

খণ্ড গ্রন্থ হতে যদি ছন্দ চুরি করি।
বঙ্গ ভাষা ব্যক্ত আছে বৃথা ধরাপড়ি ॥"

এই "খণ্ড গ্রন্থ" যে দৌলত কাজীর "সতী ময়না" তাহাতে সন্দেহ নাই। মনে হয়, কবি শমশের আলী যখন "রিজওয়ান শাহ" লিখিতেছিলেন তখনও "সতী ময়না" আলাওল কর্তৃক পরিসমাপ্ত করা হয় নাই, এবং খণ্ডাকারেই দেশে প্রচারিত ছিল। সুতরাং তিনি এই "খণ্ড গ্রন্থ" হইতে রূপ বর্ণনা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এইরূপ বর্ণনায় তিনি যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তিনি দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ কবি আমীর খুস্রু। এ সম্বন্ধে তাহার উক্তি এইরূপ :—

দিল্লীর খোসবর কবি ফারসী ভাষায়। রচিয়াছে সিরীচিন্ত সরস পোথায় ॥
সেই ব্যাখ্যা হতে ছন্দ আনিতে আরতি। সিরী অলঙ্কারে সাজাইতে চন্দ্রাবতী ॥
নিজ অল্প ইচ্ছামত করিলে রচন। কোন কিবা বোলে তাহে ভয় ভাবি মন ॥
কিন্তু কবি সব কাব্য বুঝিতে না পাবি। তথাপিহ সাধ্য অনুমান চেষ্টা করি

জানিতে পারা যায়, দৌলত কাজীর অকাল মৃত্যুর সংবাদে, পণ্ডিত শমশের আলী নিজ ভাগ্য-পরিবর্ত্তন-মানসে আরকানে গমন করেন, এবং তথায় তাঁহারও অকাল মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি রোসাঙ্গেই "রিজওয়ান শাহ" লিখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার জীবন-কাহিনী ও রোসাঙ্গ-প্রসঙ্গটুকু ছাপার পুথী হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাপি ছাপার পুথীর শেষভাগে দেখা যায়,— "রোসাঙ্গ প্রসঙ্গ আদ্যে শেষে চট্টগ্রাম"। ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয়, পুস্তকের প্রথম ভাগে রোসাঙ্গের বিবরণ ছিল। সুতরাং তাহার রোসাঙ্গ গমনের প্রবাদ সত্য বলিয়া মনে হয়। খুব সম্ভব, তিনি রোসাঙ্গ-রাজ-অমাত্যদের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার ভণিতার সঙ্গে কাহারও নাম যুক্ত নাই।

"রিজওয়ান শাহ" একটি উপাখ্যানমূলক কাব্য। কাব্যে বর্ণিত স্থান খোরাসান ও পারস্য প্রভৃতি দেশ হইলেও, বাঙ্গালা দেশের নানা প্রচলিত কাহিনীর সমাবেশে, ফারসী নামের অন্তরালে মূল কাব্য লিখিত। তথাপি হিরালাল সাধু অর্থাৎ বণিক, চিত্রপ্রভা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতির আমদানীতে বাঙ্গালা দেশ একেবারে বিসর্জ্জিত হয় নাই।

কবি শমশের আলী একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ফারসী ও উর্দ্দু ভাষায় অধিকার ছিল। তাহার প্রমাণ উপর্য্যুদ্ধৃত অংশে রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনি সংস্কৃত ভাষায় ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু বটতলার অত্যাচারে সংস্কৃত শ্লোকগুলির দুর্দ্দশার অন্ত নাই।

কবি শমশের আলী দৌলত কাজীর সহিত তুলিত হইবার যোগ্য নহেন। তথাপি তাহার কাব্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির উপযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহার ভাষা সংস্কৃতমূলক ও ছন্দ বেশ পরিপাটি। তাহার নমুনা দেখুন :—

"দেখি মন, উচাটন, হইল কুমার।
বাঞ্ছা আসে, সখি পাশে, করিলা পুছার।

ওহে সখি, কহ দেখি, এই কোন জন।
বিনি ফান্দে, মন বান্ধে, জগত মোহন ॥" ইত্যাদি

অন্যত্র :—

"ভুরু ধনু যুগ মধ্যে কটাক্ষের বান।
ইন্দ্র ধনু নহে সেই ধনুক সমান ॥
ইন্দ্র ধনু মাঝে নাই শবের সন্ধান।
ভুরু শরাসন যত্নে নিত্য ক্ষেপেবান ॥" ইত্যাদি।

(গ) মোহাম্মদ খান

(গ) **মোহাম্মদ খান** (১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত) :—সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের মধ্যে ইঁহার স্থান অতি উচ্চে। ইঁহার উপর রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের কোন বিশেষ প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি সময়ের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া ইঁহাকে এ স্থানে স্থান দিতে বাধ্য হইলাম। নতুবা ইঁহার সম্বন্ধে পৃথক্ ও বিস্তৃত-ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত।

ইঁহার রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়খানির নাম ও পৃথক পৃথক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, যথা—(১) মকতুল হোসেন, (২) কাসিমের লড়াই, (৩) দজ্জালের বয়ান, (৪) হানিফার পত্র পাঠ, (৫) কেয়ামত নামা। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এতগুলি পুথীর মধ্যে মূল পুথী দুইখানি, এবং তাহা (১) মক্তুল হোসেন ও (২) কেয়ামত নামা। এই কবির "মক্তুল হোসেন" ও "কেয়ামত নামা" চট্টগ্রামে এতই আদৃত যে, আলাওল ও দৌলত কাজীর গ্রন্থ ব্যতীত আর কাহারও গ্রন্থ তেমন নহে। চট্টগ্রামে এমন দিনও গিয়াছে, ইঁহার "মকতুল হোসেন" মহরমের সময় ঘরে ঘরে সুর করিয়া দল বাঁধিয়া পড়া হইত ; এখনও কোথাও কোথাও হইয়া থাকে।

"মকতুল হোসেন" এই নামীয় ফারসী গ্রন্থেরই ভাবানুবাদ। ইহাতে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পৌত্র হোসেনের কারবালা প্রান্তরে নিধন-কাহিনী করুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিষয়টি যতখানি ঐতিহাসিক, কাব্যে ততখানি ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয় নাই বলিয়া সর্ব্বত্র কাব্য-রস বিশদরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যখানি করুণ রসের অফুরন্ত ভাণ্ডার। সরল, মধুর ও কবিত্বপূর্ণ ভাষায়, সপ্তদশ শতাব্দীর অল্প কবিই তাঁহার সহিত দাঁড়াইতে সক্ষম। আধুনিক যুগের মীর মোশাররফ্ হোসেনের "বিষাদ-সিন্ধু" ব্যতীত মহরমের ঘটনা লইয়া বাঙ্গালা ভাষায় যত পুথী ও পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। এই যুগেও ইহার প্রচার ও প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

"কেয়ামত নামা" পুস্তকখানিও "মক্তুল্ হোসেনের" ন্যায় একটি বিরাট গ্রন্থ। এই পুথী খানির রচনার তারিখ এইরূপ :—

"মুসলমানী তারিখের দশ শত ভেল।
শতের অর্দ্ধেক পাছে ঋতু বহি গেল ॥"

অর্থাৎ ১০৫৬ হিজরী বা ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহার ভাষাও "মক্তুল্ হোসেনের"

ভাষার ন্যায় সরল ও মধুর। ইহাতে মুসলমান ধর্ম্মমতে "শেষ বিচার" বা কেয়ামতের ঘটনা কখন কি ভাবে সংঘটিত হইবে এবং তৎপর পৃথিবীর যাবতীয় জীবের বিচার কিরূপে সমাধা হইবে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

"মক্তূল্ হোসেনের" ভূমিকায় কবি মুসলমান কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বিজয়ের সহিত আরব দেশ হইতে আগত কবির আদি পিতৃ পুরুষ মাহি আছোয়ারের জীবন কাহিনীটুকু জড়িত আছে। সুতরাং চট্টল-বিজয়ের কাহিনীটুকু কবি বংশপরম্পরায় লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। চট্টগ্রামের ইতিহাস রচয়িতার পক্ষে, এই কাহিনী একটি অপরিহার্য্য উপাদান। ইহা হইতে কবির যে বংশ তালিকা পাওয়া যায় তাহা এইরূপ :—

(ঘ) দোনাগাজী চৌধুরী :—ইহার রচিত কাব্যখানির নাম "সয়ফুল মুলুক বদি-উজ্জমাল"। এই নামের আর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মহাকবি আলাওল কর্ত্তৃক রচিত হয়। কিন্তু আলাওল রচিত গ্রন্থখানির নিকট দোনাগাজীর কাব্যখানি অতি হেয় ও নগণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। দোনাগাজীর কাব্যখানি পাঠ করিলে দেখা যায়, আলাওলের কাব্য পাঠ করিয়া তথা হইতে মূল গল্পটি গ্রহণ পূর্ব্বক নানা উপখ্যানকে বিনাইয়া বিনাইয়া দীর্ঘ করিয়া, তাঁহার সুদীর্ঘ কাব্যখানি অনেকটা স্বাধীনভাবে লিখিত হইয়াছিল। আলাওলের সুপ্রসিদ্ধ কাব্যখানি প্রচারিত হওয়ার কিছুদিন পরে, এই পুথীখানি লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের ধারণা। এই পুথীখানির বিরাট পাণ্ডুলিপি আমাদের নিকট রক্ষিত আছে। ইহা এত প্রাচীন

(ঘ) দোনাগাজী চৌধুরী।

যে, দেখিবা মাত্রই মনে হয়, ইহা ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে অনুলিখিত হয়। পাণ্ডুলিপিখানির আদি ও অন্ত খণ্ডিত বলিয়া কবির বিষয় বা পুথী রচনার তারিখ জানিবার উপায় নাই; আরও দুঃখের বিষয়, এত বড় কাব্য খানির কোথাও কবির ভণিতা নাই। পুথীখানি ত্রিপুরা জেলা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সংগ্রাহকের মতে কবির নাম দোনাগাজী চৌধরী ও তিনি ন্যূনাধিক ২৫০ আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। পুথীখানি পাঠ করিয়া আমাদেরও বিশ্বাস হইয়াছে,—ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ, আলাওল হইতে উপাখ্যান ভাগটি গৃহীত হইয়া লিখিত হওয়ায়, বিশেষত: আলাওলের কাব্য হইতে উৎকৃষ্ট বা সমকক্ষ হয় নাই বলিয়া কবি কাব্যখানিতে নিজের ভণিতা দিতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে এহেন ব্যাপার বিরল।

পুথীখানির রচনা বা উপাখ্যান ভাগে কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও, ইহাতে মধ্যে মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমান সমাজের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। আলাওলের কাব্যখানি অনুবাদ বলিয়া এ সকল বিষয় তাহাতে নাই; কিন্তু এদিক হইতে বিচার করিলে এ কাব্যখানির আবশ্যকতা স্বতঃই উপলব্ধি হইবে।

(৬) আবদুল নবী।

(৬) **আবদুল নবী** (১৬৮৪খ্রীঃ জীবিত):—ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা কবি। ফারসী "দাস্তানে আমীর হামজা" অবলম্বন করিয়া, ইনি ১০৯৬ হিজরী অর্থাৎ ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার "আমীর হামজা" নামক বিরাট কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এইরূপ:—

"আমির হামজার কিচ্ছা পারসী কিতাব। ন বুঝিআ লোকের মনেত পাই তাব॥
বঙ্গেত ফারসী ন জানএ সব লোকে। কেহ কেহ বুঝি কেহ ভাবে জেনা সোঁকে॥
এহি হেতু সেই কথা মুঞি রচিবার। নিজ বুদ্ধি চিন্তি মনে কৈলুম অঙ্গিকার॥"
মুছলমানি কথা দেখী মনে ডরাই। রচিলে বাঙ্গালা ভাসে কোপে কি গোঁসাই।
লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভএ। দরভাবে রচিবারে ইচ্ছিলুম হৃদএ॥"

রচনার তারিখ:—

রিতু নিধি অত্র আদি হিজরী বহিল। আমির হামজার পুথী সাঙ্গ জে হইল॥

কবি পুথীর প্রথমভাগে সুদীর্ঘ বংশ-বিবরণ দিয়াছেন। এই বংশ-বিবরণ-বর্ণনায় তিনি কবি মোহাম্মদ খানের (১৬২৬খ্রীঃ জীবিত) বংশ-বিবরণ-বর্ণনার ছন্দ ও ভাষা অনেক স্থানে অবিকল প্রয়োগ করিয়াছেন। এই বংশ-বিবরণের মতে:—

শাহাদুল্লা (খুব ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধু ব্যক্তি)
|
শাহ মারওয়ান ("যার কৃতি গৌরদেশ ভরি" = খ্যাতনামা)
|
মোহাম্মদ শরিফ
|
আবদুল নবী (কবি)

কবি আবদুল নবী চট্টগ্রাম (চাটিগ্রাম) জেলার "ছিলপুর" (ছিলিমপুর?) নামক স্থানে সিদ্দীকী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের জীবন কাহিনী ও কীর্ত্তির কথা কিছু লিখেন নাই ; কারণ :—

আপ্তকৃতি আপনে কহিতে অনুচিত।
সুনীআ না জা'নি লোকে বোলে কি কুৎসিত ॥

তাঁহার বিরাট কাব্যখানি মোট আশী-(৮০) পর্ব্বে বিভক্ত। প্রত্যেক পর্ব্বে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) খুল্লতাত আমীর হামজার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী বা তৎসম্পর্কিত কোন ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ফারসী কাব্যের অবিকল অনুবাদ নহে ; ছায়াবলম্বনে লিখিত। সুতরাং ইহাকে অনেকটা কবির স্বাধীন রচনাও বলা যাইতে পারে। পুস্তকের সর্ব্বত্র কবিত্ব নাই সত্য, কিন্তু ভাষা সর্ব্বত্র বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছে। যুদ্ধ বর্ণনায় কবি ফারসীর আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সারল্যে তাহা বেশ উপভোগ্য হইয়াছে।

এই কাব্যের স্থানে স্থানে, (সম্ভবতঃ কবি যে যে স্থানে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন তথায়,) আলাওলের প্রভাব সুস্পষ্ট। এহেন প্রভাবযুক্ত এই একটি স্থান এইরূপ :—

১।

সম্মুখে লইআ খেরী খেলে সিসুগণ।
একত্রে গাথিলে সেহ বাজে ঘন ঘন ॥

২।

শশধর ধরিতে বালক হস্ত তোলে।
অসাধ্য সাধন মাত্র গুরু কৃপা বলে ॥

৩।

উত্তুঙ্গ খিরোদ গিরি রতনে ভরিআ।
শ্যাম চাপ দিআ রাখে মদনে জরিআ ॥

এই স্থানত্রয়ের সহিত আলাওলের বিভিন্ন কাব্যের নিম্নলিখিত স্থানত্রয় তুলনা করিলে দেখা যাইবে, কবি আবদুল নবী মহাকবি আলাওল কর্তৃক কতখানি প্রভাবিত হইয়াছেন,—

১।

"সম্মুখে লইআ খেরি খেলে শিশুগণ।
একত্রে বাঁধিলে সেহ বাজে ঘন ঘন।"

(সতী ময়না—আলাওলের অংশ)

২।

"যেন চন্দ্র ধরিতে বালকে হস্ত তোলে।
কেবল ভরসা মাত্র গুরুপদ তলে। (হপ্ত পয়কর)

অথবা

শশধর ধরিতে বালকে হস্ত তোলে।
অসাধ্য সাধন মাত্র গুরু কৃপা বলে ॥

(সতী ময়না—আলাওলের অংশ)

মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিলে, ইহা যে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইত, তাহা সঠিকভাবে বলা না গেলেও মুসলমান রাজানুগ্রহে তখন ইহার দ্রুত বর্দ্ধন ও বিকাশে সাহায্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে আসিয়াও আবার আমরা রোসাঙ্গ-রাজসভায় অনুরূপ ব্যাপারই ঘটিতে দেখি। রোসাঙ্গ রাজসভাসদ "লস্কর উজীর" (=সমর সচিব) আশরফ খান, মুখ্যপাত্র (প্রধান মন্ত্রী) মাগণ ঠাকুর নবরাজ মজলিশ, সমর সচিব সোলেমান, পাত্র মুসা প্রমুখ মুসলমান আমীর ওমরাহগণ সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে আমল না দিলে, এই সাহিত্যের দীনতা সহসা ঘুচিত না। এই সকল ব্যাপার দেখিলে মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে বাঙ্গালার মুসলমানদের যত খানি হাত রহিয়াছে, হিন্দুদের ততখানি নহে। এদেশের হিন্দুগণ বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের জন্মদাতা বটে; কিন্তু তাহার আশৈশব লালন, পালন, ও রক্ষাকর্ত্তা বাঙ্গালার মুসলমান। স্বীকার করি, মুসলমান না হইলে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য মনোরম বন-ফুলের ন্যায় পল্লীর কৃষক কণ্ঠেই ফুটিয়া উঠিত ও বিলীন হইত, কিন্তু তাহা জগতকে মুগ্ধ করিবার জন্য উপবনের মুখ দেখিতে পাইত না, বা ভদ্র সমাজে সমাদৃত হইত না। এইরূপে ঘরে-বাহিরে মুসলমানেরা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে ক্রমান্বয়ে নানাভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবির বিবরণ সম্প্রতি "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়," (১৩৪১ বাং) প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার নাম সৈয়দ সুলতান। এত প্রাচীনকাল হইতে মুসলমানেরা প্রত্যক্ষ ভাবে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল,—ইহা কি মুসলমানদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাব

পরবর্ত্তী ও সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যে রোসাঙ্গ-রাজসভার প্রভাব অসাধারণ। সাহিত্যে যখন কোন নূতন আদর্শ আসিয়া দেখা দেয়, তখন তাহা সাহিত্যের নানা স্তরে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিগণ সাহিত্যে যে সকল নূতন আদর্শ লইয়া আসিলেন, তাহাও তাৎকালিক এবং তৎপরবর্ত্তী বাঙ্গালা সাহিত্যে জোরে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য, পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালা সাহিত্যে এ প্রভাব গিয়া পৌঁছে নাই। পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে, বিশেষতঃ চট্টগ্রামের সর্ব্বত্র হইতে রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের পুস্তকের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ব্ববঙ্গে রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল।

পূর্ব্ববঙ্গেই রোসাঙ্গ রাজসভা কবিদের প্রভাব।

রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের গৌণ প্রভাব বহু বিস্তৃত। আলাওলকে ভারতচন্দ্রীয় যুগের পথ প্রদর্শক বলিয়া, স্বয়ং ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলে ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাবে যে শক্তিশালী বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এ অধ্যায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, রোসাঙ্গে যখন পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত আদর্শ লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে থাকে, তখন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে অন্যান্য প্রাচীন আদর্শগুলি পরিত্যক্ত হয় নাই। তাই দেখিতে পাই, এই যুগে একই ব্যক্তির হাতে প্রাচীন ও নূতন আদর্শে সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে; যিনি ধর্ম্ম-সাহিত্য ও পদাবলী সাহিত্য লিখিতেছেন, তিনি আবার উপাখ্যান ও প্রেমমূলক কাব্য রচনায়ও মনোনিবেশ করিয়াছেন।

প্রাচীন আদর্শ একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই।

রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের সমসাময়িক বা একটু পরবর্ত্তী কবিদের বিষয়ই এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ইহাদের মধ্যে অনেকের প্রতিভা দৌলত কাজী কি আলাওলের সমকক্ষ না হইলেও, কয়েকজন কবির প্রতিভা নিতান্তই কম ছিল না। কিন্তু সকলের উপরেই, রোসাঙ্গ-রাজসভার সাধারণ প্রভাব (ইহাকে যুগ-ধর্ম্মের প্রভাবও বলা যাইতে পারে) সুস্পষ্ট। আবার অনেকেই শুধু রোসাঙ্গ-রাজসভার আদর্শে অনুপ্রাণিত নহে, দৌলত কাজী কি আলাওলের ভাব ও ভাষা শুদ্ধ চুরি করিয়া কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এ সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনার স্থান ইহা নহে, এস্থলে তাহা আলোচিত হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। তবে আলোচনা প্রসঙ্গে আবশ্যক মত স্থানে এ সকল অপ্রীতিকর কথারও উল্লেখ করিতে হইবে।

এই অধ্যায়ের পরিসর।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সাধারণতঃ মুসলমানদের উপরেই রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাব দৃষ্ট হয়।

এই যুগের কোন কোন কাব্যের পাণ্ডুলিপি হিন্দু লিপিকরের দ্বারা লিখিত; ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যগুলি হিন্দুদিগের নিকটও সমাদর লাভ করিতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাব্যগুলির আদর্শে খুব অল্প হিন্দুই নূতন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের সংগৃহীত ন্যূনাধিক ৩০০ তিন শত হিন্দু পুথীর মধ্যে মাত্র কয়েক জনকেই নূতন আদর্শ গ্রহণ করিয়া কাব্য রচনা করিতে দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি? মুসলমান কবিদের হাতেই বাঙ্গালা কাব্য এই যুগে নূতন আদর্শ লাভ করিয়াছিল। তাই কি তাঁহাদের স্থাপিত আদর্শ হিন্দু কবিদের নিকট অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছিল? ধর্ম্মের গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতা কি সাহিত্যেও সংক্রামিত হইয়া উঠে? যদি সত্যই তাহাই হয়, তবে দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়?

হিন্দুকবি ও রোসাঙ্গ-রাজসভা।

সে যাহা হউক, রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাবে, পূর্ব্ববঙ্গে যে সকল কবি জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই তারিখ পাওয়া যায় না। তবে ভাষা, ভাব ও কাব্য বিচার করিয়া যাঁহাদিগকে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া আমরা মনে করি, তাঁহাদের কথাই এই অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হইল। যাঁহাদের তারিখ এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই, তাঁহাদিগকে কি কি কারণে এ অধ্যায়ভুক্ত করা হইল, সে সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে গেলে, ও এক একটি করিয়া কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, অধ্যায়টি অযথা বাগাড়ম্বরে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। সাধারণভাবে এইটুকু আমরা বলিতে পারি যে, যাঁহারা ইহাদের কাব্যগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন, এই অধ্যায়ভুক্ত যাবতীয় কবি সপ্তদশ শতাব্দীর লক্ষণাক্রান্ত; তাই তাঁহাদের কাব্যগুলিকে এই অধ্যায়ভুক্ত করিতে হয়। এই সমুদয় কবির মধ্যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণই প্রধান:—

এই অধ্যায়ভুক্ত কবিদের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর যাবতীয় লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(ক) মরদন:— রোসাঙ্গ-রাজসভার আশু প্রভাবে যে সকল কবির আবির্ভাব হয়, তন্মধ্যে কবি মরদনই সবচেয়ে প্রাচীন ব্যক্তি। ইনি রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের ন্যায় প্রতিভাবান পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না সত্য, কিন্তু তিনি নিতান্তই হীন ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহার কাব্যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রাচীনতম বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়; এই দিক দিয়া ইহার স্থান অনেক উচ্চে। বিশেষতঃ ইহার রচনা মাগণ ঠাকুরের রচনা হইতে বিশেষ নিকৃষ্ট নহে।

(ক) মরদন।

সে যাহা হউক, ইনি নিজে তেমন কীর্ত্তিমান পুরুষ না হইলেও, ইনি অমর কবি দৌলত কাজীর সমসাময়িক ছিলেন। রোসাঙ্গ-রাজ থিরী থুধর্ম্মার রাজত্ব কালে (১৬২২—১৬৩৮ খ্রীঃ) ইনি আবির্ভূত হন। তিনি তাঁহার কাব্যের ভূমিকায় থিরী থুধর্ম্মার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"ভোবন বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গ নগরি। রাবনের জেহেন কক (কণক?) লঙ্কাপুরি॥
শ্রিশ্রি সুধর্ম্ম সাহা তথাত ইশ্বর। কামদেব পর .. পরম সোন্দর॥
ছত্র অ ধবল গজ লোক অধিপতি। ধনঞ্জয় সমস্বর বলবন্ত অতি॥
ব্রিঅস্পতি সম বুদ্ধি, দানে কর্ণ সম। রণে মহাবীর সে যে বিসাল বিক্রম॥"

দুঃখের বিষয় কবি মরদন্ তাঁহার কাব্যের ভূমিকায় নিজের কোন জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। তবে প্রসঙ্গক্রমে তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন,--

"সে রাজ্যেত (=রোসাঙ্গে) এক কাঞ্চি নামে পুরি। মোহাম্মিন মুসলমান বৈসে সে নগরি॥
আলিম মলনা বৈসে কিতাব কারণ। কায়স্থগণ বৈসে সব সেক……পরণ॥
ব্রাহ্মন সজ্জন তথাত বৈসএ পণ্ডিত। নানা কাব্য রস কথা কহে এ পুরিত॥"

ইহা হইতে মনে হয়, কবি রোসাঙ্গের "কাঞ্চি" নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করুন বা না করুন, অন্ততঃ তথায় প্রবাসী ছিলেন। এই নগরেই তিনি কাব্য-সাধনায় লিপ্ত ছিলেন, সন্দেহ নাই। যেস্থানে হিন্দু-মুসলমান (আলিম, মৌলানা, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি) সকলেই নানা কাব্য আলোচনা করিতেন, তথায় কবি কাব্য-প্রণয়ন করিয়াছিলেন,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। কবি তাহার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কেবল এইটুকুই বলিয়াছেন,--

"ইব্রাহিম খলিল পির রূপে পঞ্চবান
হীন মর্দ্দনে কহে কামাল বাখান॥"

আমাদের নিকট এই কবির একখানি কাব্যের কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার কয়খানিই খণ্ডিত। সর্ব্বপ্রাচীন পাণ্ডুলিপিখানি দেড় শত বৎসরের কম প্রাচীন নহে। পাণ্ডুলিপি কয়খানির কোনটি হইতেই, পুস্তকের কি নাম ছিল, তাহা জানা যায় না। তবে পুস্তক পাঠ করিয়া মনে হয়, পুথীখানির নাম "নছিরা নামা" ছিল। একটী পাণ্ডুলিপির এক স্থানের দুই পংক্তি এইরূপঃ—

"……নামা পঞ্চালিকা শুণ নরগণ।
পূর্ব্ব……যাছিলেক হেন বিবরণ॥"—

এই পংক্তি দুইটির যথাযথ পাঠোদ্ধার না হইলেও, প্রথম পংক্তিতে "নামা" কথাটি দেখিয়া, পুথীর বিষয়-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মনে হয়, ইহার শূন্যস্থলে "নছিরা" কথাটি ছিল। সে যাহা হউক, আমরা কবি মরদনের পুথীখানিকে আপাততঃ "নছিরা নামা" নামেই অভিহিত করিব।

কবি মরদনের "নছিরা নামা" খানি খণ্ডিত হইলেও, ইহার প্রতিপাদ্য ও মূল বিষয়বস্তু জানিয়া লইতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না। কবি লিখিয়াছেন, -দক্ষিণদিকের "আসি" নামক কোন রাজ্যে নুরুদ্দীন নামক কোন রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে আবদুল করীম ও আবদুল নবী নামক দুই ধনবান সাধু অর্থাৎ বণিক বাস করিত। দুই জনের মধ্যে গাঢ়াল অত্যন্ত মিতালি ছিল। একদা বণিকদ্বয় মৃগয়া করিতে গিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি তাহাদের একজনের পুত্র ও অপরের কন্যা জন্মে, তাহারা তাহাদের পুত্র কন্যাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করাইয়া পরস্পর বৈবাহিক হইবেন। যথাকালে নছিরা বিবি নামক আবদুল করীমের এক কন্যা এবং আবদুল ছবীর নামক আবদুল নবীর এক পুত্র জন্মে। ইহাদের বিবাহযোগ্য বয়সে, আবদুল করীম বাণিজ্যে গিয়া দৈবদশায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়ে। আবদুল নবী ইতিমধ্যে দরিদ্র আবদুল করীমের প্রতি ঘৃণা বশতঃ নছিরা বিবির সহিত স্বীয় পুত্র আবদুল ছবীরের বিবাহ না দিয়া, আবদুল গণী নামক অন্য এক

সদাগরের কন্যার সঙ্গে তাহার পুত্রের বিবাহ স্থির করিল। এ ব্যাপারে আবদুল করীম মর্ম্মাহত হইয়া প্রাচীন প্রতিজ্ঞার কথা তাহার পত্নীকে খুলিয়া বলিলে, তিনি তাঁহার বন্ধুকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে উপদেশ দিলেন। আবদুল করীম তাহাই করিল। আবদুল নবী ধনমদে বিভোর হইয়া দরিদ্র আবদুল করিমকে ভর্ৎসনা ও অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। দরিদ্র আবদুল করীমের পত্নী স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া,—"অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়"—এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য কয়েকটি গল্পের অবতারণা করেন। বলাবাহুল্য, পরে আবদুল করীমের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তখন কন্যা নছিরা বীবীর সহিত আবদুল নবীর পুত্রের বিবাহ হইল।

কবি মরদনের "নছিরা নামা" কাব্যখানি একটি মৌলিক গ্রন্থ। "পূর্ব্ব……য়াছিলেক হেন বিবরণ",—এই পংক্তি হইতে জানা যায়, কবি তাঁহার কাব্যে যে গল্পটি বা গল্পগুলি বলিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল; কবি এই গল্পগুলিকে কেবল কাব্যে রূপ দিয়াছেন। এইরূপে সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কেহ কাব্য লিখেন নাই। কোরেশী মাগণের "চন্দ্রাবতী"ও মৌলিক কাব্য, কিন্তু তাহা "নছিরা নামার" বহু পরে লিখিত হইয়াছিল। এইদিক হইতে, বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে "নছিরা নামা" সর্ব্বোচ্চে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত নয়।

(খ) শমশের আলী: ইহার লিখিত কাব্যের নাম "রিজ্‌ওয়ান শাহ" এই কাব্যের কোন হস্তলিখিত পুথী আমাদের নিকট নাই। বটতলার মুদ্রিত পুথীই আমাদের আদর্শ। হতভাগ্য বটতলার মুদ্রাকরের কারসাজীতে এই সুন্দর পুথীখানির যে চরম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি ইহার উপর নির্ভর না করিয়া উপায় নাই।

(খ) শমশের আলী।

গ্রন্থখানির তিন-চতুর্থাংশ কবি শমশের আলির রচিত। ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবার পূর্ব্বে কবি স্বর্গলাভ করেন (১)। অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশে "আছলন", "মোহাম্মদ হাকিম আলী" ও "ছেদমত আলীর" ভণিতা দেখা যায়। সুতরাং, কে ইহাকে সমাপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা ঠিকভাবে বলিবার উপায় নাই।

চট্টগ্রামের প্রাচীন হাটহাজারী (বর্ত্তমান রাউজান) থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে কবি শমশের আলীর জন্ম হয় (২)! এই সুলতানপুর গ্রামেই কবি দৌলত কাজী ও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যতদূর দেখা যায়, কবি শমশের আলী দৌলত কাজীর একটু পরবর্ত্তী কবি ছিলেন। শমশের আলী তাঁহার "রিজওয়ান শাহ" কাব্যে "চন্দ্রাবতীর"র রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া এ বিষয়ে একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন,—

এই স্থানে যোগ্য হয় রূপের বর্ণনা। কিন্তু আমি শক্তিহীন কি করি রচনা।
উরদু বহিতে ধিক যোগ্য ব্যাখ্যা নাই। ফারসী গ্রহস্ত ব্যাখ্যা অখণ্ড না পাই॥

(১) মহাকবি সমসের আলি স্বর্গে হৈল বাস। কাব্যেতে চতুর ছিল দ্বিতীয় সে ব্যাস।
খণ্ড কাব্য পুস্তক পুরিতে মোর আশ। গাহে হীন আছলমে হইয়া উল্লাস॥ (রিজওয়ান শাহা)

(২) জিলে চট্টগ্রাম মধ্যে হাটজারি থানা। সুলতানপুর মৌজা বলে সর্ব্বজনা।
সে সাকিনে শমশের মহা কবিবর। প্রথম প্রসঙ্গ কাব্য রিজওয়ান ঈশ্বর॥ (রিজওয়ান শাহা)

খণ্ড গ্রন্থ হতে যদি ছন্দ চুরি করি।
বঙ্গ ভাষা ব্যক্ত আছে বৃথা ধরাপড়ি॥"

এই "খণ্ড গ্রন্থ" যে দৌলত কাজীর "সতী ময়না" তাহাতে সন্দেহ নাই। মনে হয়, কবি শমশের আলী যখন "রিজওয়ান শাহ" লিখিতেছিলেন তখনও "সতী ময়না" আলাওল কর্তৃক পরিসমাপ্ত করা হয় নাই, এবং খণ্ডাকারেই দেশে প্রচারিত ছিল। সুতরাং তিনি এই "খণ্ড গ্রন্থ" হইতে রূপ বর্ণনা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এইরূপ বর্ণনায় তিনি যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তিনি দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ কবি আমীর খুস্রু। এ সম্বন্ধে তাহার উক্তি এইরূপ :—

দিল্লীর খোসবর কবি ফারসী ভাষায়। রচিয়াছে সিরীচিন্ত সরস পোথায়॥
সেই ব্যাখ্যা হতে ছন্দ আনিতে আরতি। সিরী অলঙ্কারে সাজাইতে চন্দ্রাবতী॥
নিজ অল্প ইচ্ছামত করিলে রচন। কোন কিবা বোলে তাহে ভয় ভাবি মন॥
কিন্তু কবি সব কাব্য বুঝিতে না পারি। তথাপিহ সাধ্য অনুমান চেষ্টা করি॥"

জানিতে পারা যায়, দৌলত কাজীর অকাল মৃত্যুর সংবাদে, পণ্ডিত শমশের আলী নিজ ভাগ্য-পরিবর্ত্তন-মানসে আরকানে গমন করেন, এবং তথায় তাঁহারও অকাল মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি রোসাঙ্গেই "রিজওয়ান শাহ" লিখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার জীবন-কাহিনী ও রোসাঙ্গ-প্রসঙ্গটুকু ছাপার পুথী হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাপি ছাপার পুথীর শেষভাগে দেখা যায়,— "রোসাঙ্গ প্রসঙ্গ আদ্যে শেষে চট্টগ্রাম"। ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয়, পুস্তকের প্রথম ভাগে রোসাঙ্গের বিবরণ ছিল। সুতরাং তাহার রোসাঙ্গ গমনের প্রবাদ সত্য বলিয়া মনে হয়। খুব সম্ভব, তিনি রোসাঙ্গ-রাজ-অমাত্যদের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার ভণিতার সঙ্গে কাহারও নাম যুক্ত নাই।

"রিজওয়ান শাহ" একটি উপাখ্যানমূলক কাব্য। কাব্যে বর্ণিত স্থান খোরাসান ও পারস্য প্রভৃতি দেশ হইলেও, বাঙ্গালা দেশের নানা প্রচলিত কাহিনীর সমাবেশে, ফার্সী নামের অন্তরালে মূল কাব্য লিখিত। তথাপি হিরালাল সাধু অর্থাৎ বণিক, চিত্রপ্রভা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতির আমদানীতে বাঙ্গালা দেশ একেবারে বিসর্জ্জিত হয় নাই।

কবি শমশের আলী একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ফারসী ও উর্দ্দু ভাষায় অধিকার ছিল। তাহার প্রমাণ উপর্য্যুদ্ধৃত অংশে রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনি সংস্কৃত ভাষায় ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু বটতলার অত্যাচারে সংস্কৃত শ্লোকগুলির দুর্দ্দশার অন্ত নাই।

কবি শমশের আলী দৌলত কাজীর সহিত তুলিত হইবার যোগ্য নহেন। তথাপি তাহার কাব্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির উপযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহার ভাষা সংস্কৃতমূলক ও ছন্দ বেশ পরিপাটি। তাহার নমুনা দেখুন :—

"দেখি মন, উচাটন, হইল কুমার।
বাঞ্ছা আসে, সখি পাশে, করিলা পুছার।

ওহে সখি, কহ দেখি, এই কোন জন।
বিনি ফান্দে, মন বান্ধে, জগত মোহন॥" ইত্যাদি

অন্যত্র :—

"ভুরু ধনু যুগ মধ্যে কটাক্ষের বান।
ইন্দ্র ধনু নহে সেই ধনুক সমান॥
ইন্দ্র ধনু মাঝে নাই শবের সন্ধান।
ভুরু শরাসন যন্ত্রে নিত্য ক্ষেপেবান॥" ইত্যাদি।

(গ) মোহাম্মদ খান (১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত) :—সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের মধ্যে ইঁহার স্থান অতি উচ্চে। ইঁহার উপর রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের কোন বিশেষ প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি সময়ের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া ইঁহাকে এ স্থানে স্থান দিতে বাধ্য হইলাম। নতুবা ইঁহার সম্বন্ধে পৃথক্ ও বিস্তৃত-ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত।

(গ) মোহাম্মদ খান।

ইঁহার রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়খানির নাম ও পৃথক পৃথক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, যথা—(১) মকতুল হোসেন, (২) কাসিমের লড়াই, (৩) দজ্জালের বয়ান, (৪) হানিফার পত্র পাঠ, (৫) কেয়ামত নামা। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এতগুলি পুথীর মধ্যে মূল পুথী দুইখানি, এবং তাহা (১) মক্তুল হোসেন ও (২) কেয়ামত নামা। এই কবির "মক্তুল হোসেন" ও "কেয়ামত নামা" চট্টগ্রামে এতই আদৃত যে, আলাওল ও দৌলত কাজীর গ্রন্থ ব্যতীত আর কাহারও গ্রন্থ তেমন নহে। চট্টগ্রামে এমন দিনও গিয়াছে, ইঁহার "মকতুল হোসেন" মহরমের সময় ঘরে ঘরে সুর করিয়া দল বাঁধিয়া পড়া হইত; এখনও কোথাও কোথাও হইয়া থাকে।

"মকতুল হোসেন" এই নামীয় ফারসী গ্রন্থেরই ভাবানুবাদ। ইহাতে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পৌত্র হোসেনের কারবালা প্রান্তরে নিধন-কাহিনী করুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিষয়টি যতখানি ঐতিহাসিক, কাব্যে ততখানি ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয় নাই বলিয়া সর্ব্বত্র কাব্য-রস বিশদরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যখানি করুণ রসের অফুরন্ত ভাণ্ডার। সরল, মধুর ও কবিত্বপূর্ণ ভাষায়, সপ্তদশ শতাব্দীর অল্প কবিই তাঁহার সহিত দাঁড়াইতে সক্ষম। আধুনিক যুগের মীর মোশাররফ্ হোসেনের "বিষাদ-সিন্ধু" ব্যতীত মহরমের ঘটনা লইয়া বাঙ্গালা ভাষায় যত পুথী ও পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। এই যুগেও ইহার প্রচার ও প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

"কেয়ামত নামা" পুস্তকখানিও "মক্তুল্ হোসেনের" ন্যায় একটি বিরাট গ্রন্থ। এই পুথী খানির রচনার তারিখ এইরূপ :—

"মুসলমানী তারিখের দশ শত ভেল।
শতের অর্দ্ধেক পাছে ঋতু বহি গেল॥"

অর্থাৎ ১০৫৬ হিজরী বা ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহার ভাষাও "মক্তুল্ হোসেনের"

ভাষার ন্যায় সরল ও মধুর। ইহাতে মুসলমান ধর্ম্মমতে "শেষ বিচার" বা কেয়ামতের ঘটনা কখন কি ভাবে সংঘটিত হইবে এবং তৎপর পৃথিবীর যাবতীয় জীবের বিচার কিরূপে সমাধা হইবে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

"মক্তূল্ হোসেনের" ভূমিকায় কবি মুসলমান কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বিজয়ের সহিত আরব দেশ হইতে আগত কবির আদি পিতৃ পুরুষ মাহি আছোয়ারের জীবন কাহিনীটুকু জড়িত আছে। সুতরাং চট্টল-বিজয়ের কাহিনীটুকু কবি বংশপরম্পরায় লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। চট্টগ্রামের ইতিহাস রচয়িতার পক্ষে, এই কাহিনী একটি অপরিহার্য্য উপাদান। ইহা হইতে কবির যে বংশ তালিকা পাওয়া যায় তাহা এইরূপ :—

মাহিআছোয়ার (আরব দেশাগত সাধু ; চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ দরবেশ "বদর শাহের" সম সাময়িক ; সর্ব্ব প্রথম চট্টল-বিজেতা কদল খাঁ গাজীর শ্রদ্ধেয় পুরুষ ; তিনি চট্টগ্রামে এক আচার্য্য নন্দনীকে বিবাহ করেন, এই হিন্দু পত্নীর গর্ভে এক সন্তান জন্মে, তাঁহার নাম "হাতিম"।)
|
হাতিম
|
ছিদ্দিক
|
রাস্তিখান (চট্টগ্রামের অধিপতি)
|
মিনাখান ("যার কীর্ত্তি গৌড়দেশ ভরি")
|
গাভুর খান (ত্রিপুরা বিজেতা ; নবরাজধানীর স্থাপয়িতা)
|
হামজা খান (পিতার রাজ্য শাসন করিলেন)
|
নসরত খান ("চট্টগ্রাম দেশ কান্ত")
|
জলাল খান ("সমরেত ভৃগুপতি সম")

| |
বিরাহিমখান মুবারিজ খান
|
মোহাম্মদ খান (কবি)

(ঘ) দোনাগাজী চৌধুরী :—ইহার রচিত কাব্যখানির নাম "সয়ফুল মুলুক বদি-উজ্জমাল"। এই নামের আর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মহাকবি আলাওল কর্ত্তৃক রচিত হয়। কিন্তু আলাওল রচিত গ্রন্থখানির নিকট দোনাগাজীর কাব্যখানি অতি হেয় ও নগণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। দোনাগাজীর কাব্যখানি পাঠ করিলে দেখা যায়, আলাওলের কাব্য পাঠ করিয়া তথা হইতে মূল গল্পটি গ্রহণ পূর্ব্বক নানা উপখ্যানকে বিনাইয়া বিনাইয়া দীর্ঘ করিয়া, তাঁহার সুদীর্ঘ কাব্যখানি অনেকটা স্বাধীনভাবে লিখিত হইয়াছিল। আলাওলের সুপ্রসিদ্ধ কাব্যখানি প্রচারিত হওয়ার কিছুদিন পরে, এই পুথীখানি লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের ধারণা। এই পুথীখানির বিরাট পাণ্ডুলিপি আমাদের নিকট রক্ষিত আছে। ইহা এত প্রাচীন

(ঘ) দোনাগাজী চৌধুরী।

যে, দেখিবা মাত্রই মনে হয়, ইহা ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে অনুলিখিত হয়। পাণ্ডুলিপিখানির আদি ও অন্ত খণ্ডিত বলিয়া কবির বিষয় বা পুথী রচনার তারিখ জানিবার উপায় নাই; আরও দুঃখের বিষয়, এত বড় কাব্য খানির কোথাও কবির ভণিতা নাই। পুথীখানি ত্রিপুরা জেলা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সংগ্রাহকের মতে কবির নাম দোনাগাজী চৌধরী ও তিনি ন্যূনাধিক ২৫০ আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। পুথীখানি পাঠ করিয়া আমাদেরও বিশ্বাস হইয়াছে,—ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ, আলাওল হইতে উপাখ্যান ভাগটি গৃহীত হইয়া লিখিত হওয়ায়, বিশেষত: আলাওলের কাব্য হইতে উৎকৃষ্ট বা সমকক্ষ হয় নাই বলিয়া কবি কাব্যখানিতে নিজের ভণিতা দিতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে এহেন ব্যাপার বিরল।

পুথীখানির রচনা বা উপাখ্যান ভাগে কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও, ইহাতে মধ্যে মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমান সমাজের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। আলাওলের কাব্যখানি অনুবাদ বলিয়া এ সকল বিষয় তাহাতে নাই; কিন্তু এদিক হইতে বিচার করিলে এ কাব্যখানির আবশ্যকতা স্বতঃই উপলব্ধি হইবে।

(৬) **আবদুল নবী** (১৬৮৪খ্রীঃ জীবিত):—ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা কবি। ফারসী "দাস্তানে আমীর হামজা" অবলম্বন করিয়া, ইনি ১০৯৬ হিজরী অর্থাৎ ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার "আমীর হামজা" নামক বিরাট কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এইরূপ:—

(৬) আবদুল নবী

"আমির হামজার কিচ্ছা পারসী কিতাব। ন বুজিমা লোকের মনেত পাই তাব॥
বঙ্গেত ফারসী ন জানএ সব লোকে। কেহ কেহ বুজি কেহ ভাবে জেনা সোঁকে॥
এহি হেতু সেই কথা মুক্রি রচিবার। নিজ বুদ্ধি চিন্তি মনে কৈলুম অঙ্গিকার॥"
মুছলমানি কথা দেখী মনেত ডরাই। রচিলে বাঙ্গালা ভাসে কোপে কি গোঁসাই॥
লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভএ। দরভাবে রচিবারে ইচ্ছিলুম হৃদএ॥"

রচনার তারিখ:—

রিতু নিধি অব্র আদি হিজরী বহিল। আমির হামজার পুথী সাঙ্গ জে হইল॥

কবি পুথীর প্রথমভাগে সুদীর্ঘ বংশ-বিবরণ দিয়াছেন। এই বংশ-বিবরণ-বর্ণনায় তিনি কবি মোহাম্মদ খানের (১৬৪৬খ্রীঃ জীবিত) বংশ-বিবরণ-বর্ণনার ছন্দ ও ভাষা অনেক স্থানে অবিকল প্রয়োগ করিয়াছেন। এই বংশ-বিবরণের মতে:—

শাহাতুল্লা (খুব ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধু ব্যক্তি)
|
শাহ মারওয়ান ("যার কৃতি গৌরদেশ ভরি" = খ্যাতনামা)
|
মোহাম্মদ শরিফ

আবদুব নবী (কবি)

কবি আবদুল নবী চট্টগ্রাম (চাটিগ্রাম) জেলার "ছিলপুর" (ছিলিমপুর?) নামক স্থানে সিদ্দীকী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের জীবন কাহিনী ও কীর্ত্তির কথা কিছু লিখেন নাই; কারণ :—

আপ্তকৃতি আপনে কহিতে অনুচিত।
সুনীআ না জানি লোকে বোলে কি কুৎসিত ॥

তাঁহার বিরাট কাব্যখানি মোট আশী-(৮০) পর্ব্বে বিভক্ত। প্রত্যেক পর্ব্বে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) খুল্লতাত আমীর হামজার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী বা তৎসম্পর্কিত কোন ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ফারসী কাব্যের অবিকল অনুবাদ নহে; ছায়াবলম্বনে লিখিত। সুতরাং ইহাকে অনেকটা কবির স্বাধীন রচনাও বলা যাইতে পারে। পুস্তকের সর্ব্বত্র কবিত্ব নাই সত্য, কিন্তু ভাষা সর্ব্বত্র বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়াছে। যুদ্ধ বর্ণনায় কবি ফারসীর আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সারল্যে তাহা বেশ উপভোগ্য হইয়াছে।

এই কাব্যের স্থানে স্থানে, (সম্ভবতঃ কবি যে যে স্থানে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন তথায়,) আলাওলের প্রভাব সুস্পষ্ট। এহেন প্রভাবযুক্ত এই একটি স্থান এইরূপ :—

১।
সমুখে লইআ খেরী খেলে সিসুগণ।
একত্রে গাথিলে সেহ বাজে ঘন ঘন ॥

২।
শশধর ধরিতে বালক হস্ত তোলে।
অসাধ্য সাধন মাত্র গুরু কৃপা বলে ॥

৩।
উত্তুঙ্গ খিরোদ গিরি রতনে ভরিআ।
শ্যাম চাপ দিআ রাখে মদনে জরিআ ॥

এই স্থানত্রয়ের সহিত আলাওলের বিভিন্ন কাব্যের নিম্নলিখিত স্থান যাইবে, কবি আবদুল নবী মহাকবি আলাওল কর্ত্তৃক কতখানি প্রভাবিত হইয়াছেন,—

১।
"সম্মুখে লইআ খেরি খেলে শিশুগণ।
একত্রে বাঁধিলে সেহ বাজে ঘন ঘন।"
(সতী ময়না—আলাওলের অংশ)

২।
"যেন চন্দ্র ধরিতে বালকে হস্ত তোলে।
কেবল ভরসা মাত্র গুরুপদ তলে। (হপ্ত পয়কর)

অথবা

শশধর ধরিতে বালকে হস্ত তোলে।
অসাধ্য সাধন মাত্র গুরু কৃপা বলে ॥
(সতী ময়না—আলাওলের অংশ)

"কনক কলসী কিবা ভরিআ রতন।
শ্যাম চাপ শিরে দিআ রাখিছে মদন॥"
(পদ্মাবতী)

তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে আলাওলের প্রভাব দৃষ্ট হইলেও, ভাষার তারল্যে ও সারল্যে তিনি আলাওলকে পশ্চাতে ফেলিবেন, সন্দেহ নাই। আলাওল পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কাব্য-গুলি পাণ্ডিত্যের অফুরন্ত খনি। আবদুল নবী পণ্ডিত নহেন, স্বভাব কবি; সুতরাং, তাঁহার কাব্য পাণ্ডিত্যবর্জ্জিত হইলেও খুবই প্রাঞ্জল।

তাঁহার এই কাব্যখানি কাশীরাম দাসের মহাভারতের সঙ্গে সহজেই তুলিত হইবার যোগ্য। কাশীরাম কবি আবদুল নবীর একটু পূর্ব্বাবর্ত্তী লোক হইলেও, কোন অংশে মুসলমান কবি হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন। বিষয় বস্তু হিসাবে "আমীর হামজা" ও কাশীরাম দাসের মহাভারত" অনেকটা একই জাতীয় পুস্তক। আকারে ও পৃষ্ঠার সংখ্যায় "আমীর হামজা" "মহাভারত" হইতে ক্ষুদ্র নহে। এত বড় বিরাট গ্রন্থে কবি আবদুল নবী ঐতিহাসিক "হামজা"কে" কেন্দ্র করিয়া কত কথা বলিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কাশীরাম দাসের ন্যায় আবদুল নবীর নিজস্ব সৃষ্টি এই পুস্তকে বিস্তর। আবদুল নবীর ভাষায় ও কাশীরাম দাসের ভাষায় কোন বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। তবে আধুনিক যুগে কাশীরাম সংস্কৃত হইয়া একটু ভদ্রতা অর্জ্জন করিয়াছেন আর আবদুল নবী কীট দষ্ট পুথীর মধ্যে বাস করিয়া এখনও একটু প্রাচীনত্ব ও প্রাচীন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেছেন;—এইটুকুই যাহা প্রভেদ। তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য, আমরা দুই কবির দুই স্থল এইস্থানে উদ্ধৃত করিলাম:—

(মহাভারত)

"অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন।
কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন॥
সূর্য্য অগ্নি প্রায় তেজ দেখি যে তোমার।
স্বর্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি বিচার।
রাজা বলে নাম আমি ধরি যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি নহুষে উৎপত্তি॥
পুণ্যবান জনের করিলাম অমান্য।
সেই হেতু আমার হইল ক্ষীণ পুণ্য॥
কাশীরাম দাস আদি পর্ব্ব।

(আমীর হামজা)

হাঙ্কারি লন্দুরে বোলে হামজার ঠাই।
তুমি কোন হও চোর রাখসি ছাপাই॥

আমিরে বোলন্ত আমি আরব নন্দন।
হামজা মোহর নাম বিদিত ভোবন॥
আমিরের নাম সুনি লন্দুরে বোলএ।
আমাক বান্দিতে তুমি আইলা মোহাসএ॥
আমিরেহ বুলিলেন্ত, আমি সেহ জান।
তা সুনি লন্দুরে গদা লই তুরমান॥
হামজাক ডাকি তবে বুলিলেক বানি।
আপু সাম্বালিআ রহ বিক্রমে সন্দানী॥
আমিরে ছিফর ধরি রহিলেক আগে।
লন্দুরে গুরুজ হানিলেক মোহাবেগে॥
গদার জে সম্ব ঘাতে মোহা শব্দ ভেল।
সিন্ধু উথলিআ যেন ভুমিগ্রহ গেল॥
হাঙ্কারিআ বোলে কৈলুঁ আরব সংহার।
আসিবে বোলন্ত মিথ্যা না বোল দুর্ব্বার॥
আমিরে বোলন্ত জাকে রাখে করতার।
মিথ্যা কেনে বোল মোকে করিলি সংহার॥

পাঠক উপর্য্যুদ্ধৃত অংশ দুইটি তুলনা করিয়া দেখুন; দেখিতে পাইবেন, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের (দীনেশ বাবুর মতে—বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সং, পৃঃ ৪৪৫) কাশীদাস পরবর্ত্তী যুগে কিরূপ পরিবর্ত্তিত (এবং কে জানে কত পরিবর্দ্ধিত) হইয়াছে। এত পরিবর্ত্তনের ফলেই আজ তিনি আবদুল নবীর সহিত একস্থান লাভ করিতেছেন। আবদুল নবী কোন বিষয়ে কাশীরাম হইতে নিকৃষ্ট ত নহেই, বরং অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। এ স্থলে এ সকল বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা সম্ভবপর নহে, নতুবা দুই জনের বিস্তৃত সমালোচনামূলক তুলনায়, কে কোন্ জন হইতে শ্রেষ্ঠ তাঁহা ভালরূপে প্রমাণ করা যাইত।

(চ) সৈয়দ মোহাম্মদ আকবরঃ—(১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম)ঃ—ইনি মুস্‌লিম বঙ্গের একজন খ্যাতনামা কবি। বটতলার প্রসাদে আজ বাঙ্গালী মুসলমানের ঘরে ঘরে তাঁহার "জেবল মুলুক শামারোখ" নামক কাব্যখানি সমাদৃত ও পঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বটতলার যদৃচ্ছা অত্যাচারে যাবতীয় পুথীর যেই দুর্দ্দশা, ইহাও তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই।

(চ) সৈয়দ মোহম্মদ আকবর

পুথী খানিতে কবির কোন পরিচয় নাই। সুতরাং তাহার বাসস্থান বা জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণই অজ্ঞ। আমাদের নিকট এই কবির যে কয়েকখানি হস্ত লিখিত পুথী আছে, তাহা ত্রিপুরা জেলা হইতে সংগৃহীত। পুথীর ভাষা সর্ব্বত্র যেরূপ সুন্দর ও সুষ্ঠু বাঙ্গালায় লিখিত, তাহা পাঠ করিয়াও কবির বাসস্থান নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পুথীর পাণ্ডুলিপি যখন ত্রিপুরা জেলা হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে, তখন মনে হয়, কবির বাসস্থান ত্রিপুরা জেলার কোথাও ছিল।

"জেবল মুলুক-শামারোখ" একখানি বৃহৎ কাব্য। দীর্ঘাকার ছাপার পুথিতেও ইহার পত্র সংখ্যা ১৬৮। অত বড় বৃহৎ কাব্যখানি কবি যে বয়সে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। জানিতে পারা যায়, মোহাম্মদ আকবরের (জন্ম ১৬৫৭ খ্রীঃ) পঁয়ষট্টি বৎসরের পরবর্ত্তী কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র (জন্ম, ১৭২২ খ্রীঃ—মৃত্যু ১৭৬০ খ্রীঃ) পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে "সত্যপীরের কাহিনী" নামক দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মোহাম্মদ আকবর ষোড়শ বর্ষ বয়সে তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার কাব্যের নায়িকা শামারোখের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

'কহন না জায় দেখি বাঙ্গালার ভাস॥
ফারছি হইত জদি কহিত বাখানি।
কলা অব্দ বয়সেত রচিল কাহিনী॥"—

এই "কলা অব্দ" অর্থাৎ ষোড়শ বর্ষ বয়সে এমন সুন্দর এত বড় একখানি কাব্য প্রণয়ন করা সাধারণ প্রতিভার কাজ নহে। এই হিসাবে ভারতচন্দ্র ও তাঁহার সহিত তুলিত হইবার যোগ্য নহেন; কেননা যেই বিদ্যাসুন্দরের জন্যই ভারতচন্দ্রের খ্যাতি, তাহা তাঁহার মৃত্যুর মাত্র ৮ আট বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। কবি মোহাম্মদ আকবরের পূর্ব্বে বাঙ্গালার আর কোন কবি এত অল্প বয়সে এমন বৃহৎ ও সুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া, আমাদের জানা নাই। ইহা যে কবির অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহারে তাঁহার যেরূপ পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্ব দেখিতে পাই, তাহা দৌলত কাজীও আলাওল ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার এহেন অধিকার থাকিলেও, এত অল্প বয়সে তিনি ফারসী ভাষায় ইত্যধিক অধিকার অর্জ্জন করিয়াছিলেন; তাহার আভাস আমরা উপর্য্যুদ্ধৃত অংশে প্রাপ্ত হই। তাঁহার কাব্য রচনার তারিখটিও তিনি ফারসী অর্থাৎ আরবী ভাষায় ব্যবহৃত আক্ষরিক সঙ্কেতে (chronogram) প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা এইরূপ:—

'লিখন সমাপ্ত হইল কাকে ডিম্ব দিল।
আরবা অনাছের মধ্যে ভাস্কর ভাসিল॥"—

এই শ্লোকটির "আরবা অনাছের" অর্থাৎ "অরবঅ উনাস্বীর্" বাক্যে ফারসী "আব্জদ্" রীতিতে অর্থাৎ আক্ষরিক সঙ্কেতে তারিখ দেওয়া আছে। এই হিসাবে আমরা ১০৮৪ হিজরী লাভ করি; সুতরাং পুস্তকখানি ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

এই কাব্যখানিতে একটি প্রেমমূলক উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্য রচনায় পাঠককে নিছক আনন্দ দান করাই কবির উদ্দেশ্য। তিনি তাঁহার কাব্যে স্পষ্ট ভাষায় তাঁহার উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করিয়াছেন:—

"জেবল মুলুক কথা কহিনু রচিয়া। সুনিআ রসিক মনে রহুক পসিআ॥
মোহম্মদ আকবরে কহে রসের বাহার। রসিকে চিনিতে পারে রসের ভাণ্ডার॥

এই জন্যই বোধ হয়, তাঁহার কাব্যে কবি কল্পনাপ্রসূত একটি উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও কাব্যে বর্ণিত চরিত্রগুলি মুসলমানী নাম বহন করিতেছে, তথাপি দেখা যায় কাব্যের বর্ণিত ঘটনাবলী ভারতেই অনুষ্ঠিত হয়। এই যুগের কবিগণের প্রায় সকলেই পারস্য, বোখারা প্রভৃতি দেশকেই কাব্যের পটভূমিতে পরিণত করিয়াছিলেন; এমন কি ভারতের কাহিনী এবং বাঙ্গালার উপাখ্যানের পটভূমিও ছিল পারস্য, বোখারা প্রভৃতি দেশ। কিন্তু মোহাম্মদ আকবর এ বিষয়ে তাঁহার সহযোগিগণকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন; তিনি তাঁহার কাব্যের পটভূমি ভারতবর্ষেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

কাব্যে বর্ণিত উপাখ্যানটিতে বিশেষ কোন সৃষ্টি নৈপুণ্য বা বৈশিষ্ট্য নাই। তবে কবির বর্ণনা-চাতুর্য্যে ও লিপিকৌশলে তাহা বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এইরূপ:— একদা কর্ণাট-রাজ চন্দ্রদেব চামরী-রাজ শাহা সুলতানের রাজ্য লুণ্ঠন করিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চামরী-রাজ কর্ণাট রাজ্য আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া তদীয় কন্যা রতিকলাকে বিবাহ করেন ও চামরী দেশে লইয়া আসেন। ইহার পর শাহা সুলতান বেশ সুখে ও স্বচ্ছন্দে দাম্পত্যসুখ উপভোগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

এই শাহা সুলতানের ঔরসে ও রতিকলার গর্ভে কাব্যের নায়ক জেবল মুলুকের জন্ম হয়। শাহা সুলতানের মন্ত্রিপুত্র ফোরখপাল ও জেবলমুলুক সমবয়সী ছিলেন। তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। কালক্রমে উভয়েই যৌবন সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

এমন সময় একদিন জেবলমুলুক মৃগয়া করিতে গমন করেন এবং তথায় এক বনে গন্ধর্ব্ব কুমারী শামারোখের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দৃষ্টিতে উভয়ে উভয়ের রূপে বিমুগ্ধ হইলেন এবং সর্ব্ব বাধা বিঘ্ন অবহেলা করিয়া পরস্পর পরিণয় পাশে আবদ্ধ হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। ইহার পর গন্ধর্ব্ব কুমারী অদৃশ্য হইল, আর জেবল মুলুকের প্রিয়া লাভের অভিযান আরম্ভ হইল; তাঁহার বন্ধু ফোরখপাল তাঁহার সন্ধানে বহির্গত হইলেন।

জেবল মুলুকের এই অভিযানে কষ্টের অবধি রহিল না। ঘটনাচক্রে এই সময়ে তিনি শীরীলব ও ছনুবর নাম্নী আরও দুই রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। পরিশেষে শামারোখের সহিত তাঁহার মিলন হয় এবং তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিবার পথে শীরীলব ও ছনুবরকে সঙ্গে লইয়া আসেন। পথে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে বিষপান করাইয়া অচৈতন্য করিয়া গেলেন; বলা বাহুল্য ইতিপূর্ব্বে ফোরখপাল তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং তিনিও পিয়ারেখা নাম্নী এক রাজ-কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জেবল মুলুক বন্ধুর যত্নে বাঁচিয়া উঠিয়াছিলেন এবং তিনি পত্নীকে সঙ্গে করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এহেন একটি কাল্পনিক গল্পের সৃটি করিয়াই কবি মোহাম্মদ আকবর তাঁহার কাব্যখানি লিখিয়াছেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি গল্প সৃষ্টিতে কবির কোন কলাকৌশল প্রকাশ পায় নাই। তবে তাঁহার কাব্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, দুর্জ্জয় মানব-প্রেম মানব-জগতের বহির্ভূত গন্ধর্ব্ব-রাজ্যও জয় করিতে সমর্থ। মানব-প্রেমের এহেন দুর্ব্বার শক্তি বাঙ্গালা কাব্য-জগতে বোধ হয় এই-ই প্রথম

স্বীকৃত হয়। কিন্তু এ প্রেম কামজ প্ররোচনার ক্ষণিক উন্মত্ততা বা উদ্দামতা নহে; জীবনকে পণ রাখিয়া তদ্বিনিময়েই ইহাকে লাভ করিতে হয়। যিনি মহা ভাগ্যফলে এহেন প্রেমের অধিকারী হইতে পারেন, ভগবান তাঁহার সহায় হন, তিনি একদিন না একদিন প্রিয়ার দর্শন দানে জীবনকে ধন্য করেন। এ প্রেম সম্ভোগ-সুখের প্রেম নহে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির লালসা নহে; ইহা কুমুদের সহিত শশীর এবং কমলের সহিত রবির প্রেম। এ প্রেমের আদর্শ জগতে বিরল, স্বর্গেই সুলভ। কবির এই কয়টি কথা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়ঃ—

"মহারাণী ডাকি রাজা কহে ক্রোধ করি। তোমা গর্ভে জন্ম হৈল কলঙ্কী কুমারী ॥
মনুষ্য বরিতে চাহে কন্যা স্বয়ংবরে। কলঙ্ক ঘোষিল মোর সয়াল সংসারে ॥
কাল মাথা মানুষের কুরূপ কুরঙ্গে। কিরূপে বঞ্চিবে কন্যা মানুষের সঙ্গে ॥

*   *

এ বলিয়া কন্যাস্থানে সখী পাঠাইল। গঞ্জিআ কহিতে সব শিখাইআ দিল ॥
কুমারীর স্থানে গিআ কহে সখিগণ। মনুষ্যের প্রেম তুমি ছাড়হ এখন ॥
এ সপ্ত সমুদ্র পার কিরূপে আসিবে। চলিতে চলিতে তার আয়ু শেষ হবে ॥
কন্যা কহে হেন কথা কহ কি কারণ। চাহিলে আনিতে পারে এথা নিরঞ্জন ॥
কমল কুমুদ এথা, স্বর্গে রবি শশী। এথা সেথা উচ্চ নীচ প্রেম অভিলাষী ॥"

কবি মোহাম্মদ আকবরের ভাব ও রূপ বর্ণনায় আলাওলের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু এ প্রভাবে কবি ঢাকা পড়েন নাই। তাহার প্রতিভা আলাওলের প্রভাবকে ঠেলিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, যদিও—

"মুখ জ্যোতি দেখি শশী পাইলেক লাজ। পলাই রহিল গিআ জলধের মাঝ ॥
লোচন কুরঙ্গ ভানে হরিণা শ্রবন। রামের গাণ্ডিব ভুরু করিছে স্থাপন ॥"

প্রভৃতি পদে আলাওলের ভাব ও ভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট, তথাপি—

"অধরে মধুর রস যেবা মধু পিএ। শত বৎসরের মৃত ততক্ষণে জিএ ॥
সুধামুখ হাসি যদি দশন দেখএ। সপ্ত স্বর্গ জ্যোতির্ম্মএ তবে প্রকাশএ ॥

প্রভৃতি পদে আলাওলও কল্পনার আতিশয্যে হার মানিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের নানা স্থলে যেরূপ মধুর কবিত্ব ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাও সাধারণ কবির মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। এই কবিত্বময় অংশটুকু সাধারণতঃ নায়ক-নায়িকার দুঃখ ও আবেগ বর্ণনাকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার সামান্য নমুনা দেখুনঃ—

"বাহিরে বরিষা জল ঘরে আখির পানি। এক তিল স্থান নাই শুখনা মেদিনী ॥
শুনিতে না পারি আর চাতকীর নাদ। এছার জীবনে মোর আর নাই সাধ ॥"

"কুক্ষণে জনম হৈনু কুল কলঙ্কিনী হৈনু,
জগতে রহিল অপবাদ।
পাপিনী কহিবে সবে, পিতৃ মাথা হেট হবে,
সবে কবে জন্মিল আপদ ॥"

কবি মোহম্মদ আকবর তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণটি লিখিয়াছেন, তাহা বড়ই চমৎকার ও উপভোগ্য। দুঃখের বিষয় বটতলার ছাপা পুথীতে ইহা পরিত্যক্ত হইয়া, কোথা হইতে অন্য একটি বন্দনা সংযোজিত হইয়াছে। কবি তাঁহার বন্দনায় হিন্দু ও মুসলমান বিশ্বাসের মধ্যে কি কি সমান বস্তু আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, একটি বেশ উপভোগ্য বর্ণনা দান করিয়াছেন। তাঁহার হাতে ফিরিস্তা (angel) নারদে, আল্লা ঈশ্বরে, পয়গম্বর (prophet) দেবতায়, আদম (Adam) অনাদি নরে, হাওয়া (Eve) কালীতে, হজরত মোহাম্মদ চৈতন্যাবতারে, খাজা খিজির বাসুদেবে, আসহাব্‌গণ (companions of the Prophet) দ্বাদশ গোপালে, আওলিয়া আম্বিয়া (Muslim saints) মুনিতে কোরান পুরাণে, এবং পীর, মুর্‌শিদ্ ও ওস্তাদ গুরুতে পরিণত হইয়াছেন ; যথা—

"বিনএ করিআ বন্দি ফিরিস্তার পদ। ছুন্নিকুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুতে নারদ॥
তক্ত সিংহাসন বন্দি আল্লার দরবারে। হিন্দুকুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচারে॥
পএগাম্বর সকল বন্দি করিআ ভকতি। হিন্দুকুলে দেবতা হেন হইল প্রকৃতি॥
হজরত আদম বন্দি জগতের বাপ। হিন্দুকুলে অনাদি নর প্রচার প্রতাপ॥
মা হাওয়া বন্দম জগত জননী। হিন্দুকুলে কালী নাম প্রচারে মোহিনী॥
হজরত রছুল বন্দি প্রভু নিজ সখা। হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্যরূপে দেখা॥
খোআজ খিজির বন্দম জলেত বসতি হিন্দুকুলে বাসুদেব শূন্যে যে প্রকৃতি॥

* *

আছব্বা সকল বন্দি নবীর সভাএ। হিন্দুকুলে দোয়াদস গোপাল ধেয়াএ॥
আওলিয়া আম্বিয়া বন্দি রব্বানি কোরান। হিন্দুকুলে মুনিভাব আছএ পুরাণ॥
পীর মুর্সিদ বন্দম ওস্তাদ চরণ। হিন্দুকুলে গুরু যেন করএ পূজন॥"

(ছ) মোহাম্মদ রাজা ঃ—ইনি দুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, একটির নাম "তমিম-গোলাল" ও অপরটির নাম "মিছরী জমাল"। বটতলার প্রসাদে ইঁহার "তমিম-গোলাল" নামক কাব্যখানি এখন মস্‌লিম্ বঙ্গে সুপরিচিত, "মিছরী জমাল" ইহা হইতে নিকৃষ্ট গ্রন্থ নহে। গ্রন্থ দুইখানিই প্রেমমূলক উপাখ্যান, আবার উপাখ্যানগুলিও মামুলী।

(ছ) মোহাম্মদ রাজা।

"তমিম-গোলালে" কবি শিমাল-রাজ ইউসুফ জলালের পুত্র তমিম-গোলাল এবং শীরাজ-রাজ-কুমারী চতুর্ণ-ছিল্লালের প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা কবিয়াছেন। নায়ক-নায়িকা যৌবনে পরস্পরকে স্বপ্নে দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন ও লাভ করিবার জন্য আকুল অধৈর্য্যে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। স্বপ্নে গন্ধর্ব্ব মতে তাঁহাদের বিবাহ হয়। অতঃপর ঃ—

দিবসে বসিয়া কন্যা গাঁথে পুষ্পহার। রাত্রিতে গোলালচন্দ্র গলেত দিবার॥
যার লাগি এত দুক্ষ দেখা নাই তার। কার লাগি প্রতিদিন গাঁথে পুষ্পহার॥

কন্যার অবস্থা যখন এইরূপ, তখন শীরাজ-রাজ কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেন। তমিম-গোলাল চতুর্ণ-ছিল্লালের স্বয়ংবরের কথা শুনিতে পাইয়া—

"তমিম গোলাল শুনি ভাবে নিরঞ্জন।
কি জানি অদৃষ্টে মোর আছে কি লিখন॥

চতুর্ণ-ছিল্লালের স্বয়ংবরে পাঁচটি সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রথম সর্ত্তে, ভীষণ পার্ব্বত্য অশ্বে জিন দিয়া আরোহণ করা; দ্বিতীয় সর্ত্তে, শীরাজ শহরে যে একটি অজগর সর্প আসিয়া অনিষ্ট করে, তাঁহাকে বধ করা; তৃতীয় সর্ত্তে, শীরাজ শহরে যে একটি রাক্ষসী প্রতিদিন এক একটি মনুষ্য খাইয়া অত্যাচার করে তাহার বধ সাধন করা; চতুর্থ সর্ত্তে, শীরাজের অনিষ্টকারী বলমিত্র নামক দৈত্যকে ধরিয়া আনা; পঞ্চম সর্ত্তে, প্রতিবৎসর যে রিপুরাজ সপ্তকোটি সৈন্য লইয়া শীরাজ-নগর বিধ্বস্ত করে, তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করা। বলা বাহুল্য, তমিম-গোলাল এক একটি করিয়া সমুদয় সর্ত্ত পূর্ণ করিয়া চতুর্ণ-ছিল্লালকে লাভ করেন।

কবি "মিছরী জমালে" কুর্ব্বার-রাজ আবদুল করিম শাহের কন্যা মিছরী জমালের সহিত বিমল-নগরাধিপতি শরীফ সুলতান শাহার পুত্র তোরাব হানীমের প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও একটি মামুলী গল্প। নায়ক-নায়িকা পরস্পরের চিত্রপট দেখিয়া প্রেমে পড়েন ও পরে উভয়ের মিলনে কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ রাজার কাব্য দুইখানিতে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি চিরাচরিত দীর্ঘ-মঙ্গলাচরণটি তাহার দুইখানি কাব্যেই কেবল দুইটি পংক্তিতে পর্য্যবসিত করিয়াছেন এবং প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শেষে স্বীয় ভণিতা না দিয়া, তাহার প্রথমে বা মধ্যেই ভণিতা দিয়াছেন। বোধ হয়, মৌলিকত্ব ও নূতনত্ব ফুটাইতে গিয়াই কবি এই ব্যাপার করিয়াছিলেন। যেরূপই হউক, তিনি একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। তবে মধ্যে মধ্যে মধ্যে বেশ একটু কবিত্ব আছে এক স্থানে তিনি এহেনভাবে বিভৎস রসের সৃষ্টি করিয়াছেন ঃ—

"রাণীর আকৃতি দেখি বিদরে পরাণ। নাকের শোয়াসে চলে বৈশাখ তুফান॥
চরণ ঝাপটে মাটি উঠে উর্দ্ধমুখে। দশ মন সোনার নত সে নারীর নাকে॥
আশী গজ শাড়ী রাণী কোমরে পিন্দিআ। বিশ মন রূপার হাসলি গলে দিআ॥ ইত্যাদি।
(তমিম গোলাল)

(জ) **মোহাম্মদ রফীউদ্দীন**ঃ—ইঁহার রচিত কাব্যখানির নাম "জেবল মুলুক শামা-রোখ"। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদ আকবর এই নামের আর একখানি কাব্য রচনা করেন। তাহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উভয় পুস্তকের ঘটনা ও বিষয় এক; তাহা কবি রফীউদ্দীনের এই সমাপ্তি বাক্য কয়টিতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে—

(জ) মোহাম্মদ রফীউদ্দীন।

"শিরিলব শামারোখ আর ছমুবর।
একপতি কোলে মিলি বঞ্চে পরস্পর॥
বিবাদ কলহ নহে সুখের বিরাজ।
সুখের নগর ধন্য চামরী সুরাজ॥
উজিরেহ নিজ সুত আর বধূমুখ।
হেরিয়া সানন্দ মন অধিক কৌতুক॥

কবি মোহাম্মদ আকবর ও মোহাম্মদ রফীউদ্দীনের মধ্যে কে পূর্ব্ববর্ত্তী বা কে পরবর্ত্তী তাহা ঠিক-ভাবে বলা কঠিন। তবে আমাদের বিশ্বাস, কবি রফীউদ্দীন কবি আকবরের পরবর্ত্তী লোক; কেননা রফীউদ্দীনের ভাষা পরিমার্জ্জিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং গল্প বলার ভঙ্গীতেও তিনি আকবরের চেয়ে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নহে। সম্ভবতঃ, কবিকঙ্কণ যেমন মাধবাচার্য্যের পুচ্ছ গ্রহণ করিয়াও শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ রফীউদ্দীনও আকবরের পুচ্ছ গ্রহণ করিয়াও শ্রেষ্ঠ। রফীউদ্দীনের হাতে ছন্দ কিরূপ খেলিয়াছে দেখুন :—

মালঝাপ :—

কোকিলান, করে গান, মোহজ্ঞান, রঙ্গে।
সুধামৃত, শুনি গীত, পুলকিত, অঙ্গে॥

ত্রিপদীভূত পয়ার :—

"শ্বাসে হয়, আয়ু ক্ষয়, না কৈল্যে বিচার।
ভাব ভাল, গত কাল, আসিবে না আর॥"

কবি রফীউদ্দীনের কাব্য হইতে জানিতে পারা যায়, তিনি ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কুমিল্লার নারানঞা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহার পিতার নাম আশরফ। তাঁহার বিষয় ইত্যধিক আর কিছু জানিতে পারা যায় না।

(ঝ) সেরবাজ :—ইঁহার দুইখানি পুস্তক এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, একখানির নাম "ফক্কর নামা" বা "মল্লিকার হাজার সওয়াল" এবং অপরখানির নাম "কাসেমের লড়াই"। ইঁহার পুথী দুইখানি দুইটি পৃথক বিষয় লইয়া লিখিত।

(ঝ) সেরবাজ

"মল্লিকার হাজার সওয়াল" নামক কাব্যখানি ফারসী "ফক্কর নামার" ভাবানুবাদ। ইহাতে কবি সেরবাজ রুমরাজ-দুহিতা মল্লিকার সহিত আবদুল্লা নামক এক ব্যক্তির পরিণয়-ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু কাব্যখানিকে ঠিক উপাখ্যান বলা চলে না; কেননা, আমরা ইহাতে দেখিতে পাই,—মল্লিকা যখন রুমরাজ্যের অধিশ্বরী হইলেন, তখনও তিনি অবিবাহিতা। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহার এক সহস্র প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হইবেন, তিনি তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। আবদুল্লা তাহাতে সফলকাম হইলেন ও মল্লিকাকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহ-ব্যাপার কাব্যের মূল বিষয় নহে। মল্লিকার প্রশ্নের ছলে নানা হিতকথা, তত্ত্ববাণী ও জ্ঞানের কথা প্রচার করাই কবির উদ্দেশ্য।

"কাসেমের লড়াই" নামক কাব্যখানিতে কবি মহরমের ঘটনার একটি যুদ্ধ মাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। হজরত ইমাম হোসেনের পুত্র বালক কাসেম, কারবালা প্রান্তরে যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বক্ষণে হজরত ইমাম হোসেনের কন্যা সখীনাকে পিতৃবাক্য রক্ষা করিবার জন্য বিবাহ করেন। বিবাহের পরেই, সখীনা তাঁহার স্বামী কাসেমকে যুদ্ধে যাইতে বিদায় দেন। কাসেম যুদ্ধে অপূর্ব্ব শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া "শহীদ" হন। এই ঘটনাই এই কাব্যের বর্ণিতব্য বিষয়।

কবি সেরবাজ একজন সাধারণ কবি। তাঁহার কাব্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন গুণ পরিলক্ষিত

হয় না। তবে, হিতকথা ও তত্ত্ববাণীর প্রচারকরূপে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে—এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

(ঞ) শেখ সা'দী:- আমরা এতদিন ফারসী সাহিত্যের সুবিখ্যাত কবি শেখ সা'দীর কথাই অবগত ছিলাম। অদ্য বঙ্গ সাহিত্যেও এক শেখ সা'দী পাওয়া গেল। কিন্তু শিরাজের গোলাপ-কুঞ্জে কবি শেখ সা'দী বুলবুলের স্থান অধিকার করিয়াছেন, আর আমাদের বাঙ্গালার তাল-তমাল-কুঞ্জে বঙ্গীয় শেখ সা'দী তেমন কোন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিবেন না—ইহাই দুঃখের বিষয়।

(ঞ) শেখ সা'দী।

সে যাহা হউক, ইঁহার রচিত কাব্যখানির নাম "গদা মল্লিকার পুথী"। কবি সেরবাজের "মল্লিকার হাজার সওয়াল" ও বর্ত্তমান "গদা মল্লিকার পুথী" একই বিষয় লইয়া লিখিত। ইহাদের মধ্যে কে পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে সেরবাজ, শেখ সা'দী হইতে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মনে হয়।

(ট) আবদুল আলীম:—ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "হানীফার লড়াই"। ইহাতে কারবালা প্রান্তরে হজরত ইমাম হোসেনের "শাহদত্" বা ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মাহুতির পরে, তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হানীফার সহিত দুর্ম্মতি এযীদের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত আছে। এই কাব্যে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নাই। কারবালার বিষাদ-কাহিনী লইয়া এই যুগে যত কবি কাব্য লিখিয়াছেন, কেহই মোহাম্মদ খানের সমকক্ষ নহেন। কবি আবদুল আলীমের রচনা এইরূপ :—

(ট) আবদুল আলীম।

"এজিদের দিন হস্তে ফিরি ততক্ষণ। নবির কলিমা পুনি পরে নারিগণ॥
কলিমা পড়িআ কহে সে সব যুবতী। শুন কহি জএনুল আবিদিন সুমতি॥
আমি সব এজিদের দিন পরিহরি। রছুলের দিনে আইল বহু যত্ন করি॥
আমি সব আন স্থানে কথাতে যাইব। ভক্ষণ পিঅন বোল কোথাতে পাইব॥
আমি সব পঞ্চশত বিধবার গণ। তোমা'দ বিনে গতি নাহি কদাচন॥
তা শুনিআ জএনুল আবিদিন সুমতি। নিয়ম করিআ দিল সে সবের প্রতি॥
ভাণ্ডারিক আজ্ঞা দিল হোচন নন্দন। সে সবেরে দিলা বহু বসন ভূষণ॥"

(ঠ) রামজী দাস:—ইনি এই যুগের একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। ইঁহার রচিত কাব্যের নাম "শশীচন্দ্রের পুথী"। ইঁহার উপর আলাওলের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইঁহার ভাষা বেশ বিশুদ্ধ ও আলাওল হইতে সরল। কবি তেমন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

(ঠ) রামজী দাস।

কাব্যের বর্ণিত বিষয়টি এইরূপ :—কাঞ্চন নগরের রাজা বিকর্ণের বিষমুখী ও তারাদেবী নাম্নী দুই মহিষী ছিল। তারাদেবীকে রাজা বিশেষ আদর করিতেন। বিষমুখীর ইহা সহ্য না হওয়ায়, তিনি তারাদেবীকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলে, তারাদেবী বলিলেন যে তিনি তাহাতে ভয় করেন না, কেননা ঈশ্বরই তাঁহার আহার যোগাইবেন। রাজা অন্তঃসত্ত্বা তারাদেবীকে সমুদ্রে ভাসাইয়া

দিলেন। তাঁহার গর্ভস্থ ভবিষ্যৎ সন্তানই গ্রন্থের নায়ক শশীচন্দ্র। এই সুদীর্ঘ গল্প বলিয়া কাজ নাই। অনেক অদ্ভুত ঘটনার পর আবার সকলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, কবি আলাওল রচিত "সতী ময়না" কাব্যের শেষাংশে, কথা প্রসঙ্গে তিনি অবিকল এইরূপ একটি গল্প বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য নাম-ধামে একটু পার্থক্য আছে। আলাওলের "আনন্দ বর্ম্মা", "রতন কলিকা", "উপেন্দ্র দেব" যথাক্রমে রামজী দাসের "শশীচন্দ্র", "তারাদেবী", ও "বিকর্ণ" রূপে শশীচন্দ্রের পুথীতে স্থান পাইয়াছে।

(ড) আবদুল হাকীমঃ—ইঁহার বাসস্থান বর্ত্তমান নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপের সুধারামে বলিয়া জানা যায়। ইঁহার পিতার নাম আবদুর্ রজ্জাক। ইনি শাহাবুদ্দীন নামক কোন পীরের চরণধ্যান করিয়া "নূর নামা", "লালমতী সয়ফুল মুলুক" এবং "ইউসুফ-জোলেখা" নামক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বটতলার প্রসাদে "লালমতী সয়ফুল মুলুক" আজ সমগ্র বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে সমাদৃত।

(ড) আবদুল হাকিম

"নূর নামা" নামক গ্রন্থখানিতে মুসলমানী বিশ্বাসানুযায়ী হজরত মোহাম্মদের আত্মা সৃষ্টির কাহিনী বর্ণিত আছে। "লালমতী সয়ফুল মুলুক" একটি বিরাট উপাখ্যান গ্রন্থ এবং "ইউসুফ জোলেখা" গ্রন্থে হজরত ইউসুফ (বাইবেলের Joseph son of Jacob) ও জোলেখার (বাইবেলের Potiphar's wife) অপূর্ব্ব প্রেম কাহিনী বর্ণিত আছে।

কবির ভাষা আলাওল অনুসারী হইলেও, বেশ প্রাঞ্জল। সরল পয়ার ছন্দে তিনি বেশ অনর্গল লিখিয়া যাইতে পারেন। ইনিও একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি।

এই কতিপয় কবি ব্যতীত রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের আশু প্রভাবে আরও অনেক কবি সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবরণ দেওয়া বা ইতিহাস লেখা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ, নিতান্তই মামুলী লেখক ও তৃতীয় শ্রেণীর কবির কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার বিশেষ আবশ্যকতাও আছে বলিয়া মনে করি না। এই কারণেই, বর্ত্তমান পুস্তক হইতে তাঁহাদিগকে বাদ দেওয়া হইল। আমাদের বিশ্বাস, আমরা যে কয়েক জন কবির নাম দিলাম, সংক্ষেপে যাঁহাদের পরিচয় দান, ও কাব্যালোচনা করিলাম, ইহা হইতে পাঠক এই শতাব্দীর প্রভাব ও সাহিত্য-সৃষ্টির ধারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই শতাব্দীতে, মুসলমান কবির দ্বারা ধর্ম্ম সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ও সৃষ্ট হয়; কিন্তু তাঁহাদের উপর রোসাঙ্গ-রাজসভা-কবিদের কোন প্রভাব নাই। সুতরাং, এহেন অনেক কবির কথাও এই অধ্যায় হইতে বাদ দেওয়া হইল।

এই যুগের বহু কবি।

এই শতাব্দীর এবং ইহার পরবর্ত্তী শতাব্দীর অধিকাংশ সময়ের মুসলমানদের সাহিত্য-সাধনা ফারসী সাহিত্য-প্রভাবে ভরপুর। ফারসী সাহিত্যের ভাব, বর্ণনা ও লিপি কৌশল এই যুগের মুসলমান

সাহিত্যকে অনেক স্থলে (অর্থাৎ যে স্থলে কবি শক্তিশালী পুরুষ নহেন সেই স্থলে) একেবারেই আড়ষ্ট করিয়া দিয়াছে ; আবার অনেক স্থলে (অর্থাৎ যে স্থলে কবি প্রতিভাবান পুরুষ সেই স্থলে) ইহাকে নূতন জীবন দানে সঞ্জীবিত ও নবীন সম্পদ দানে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। এহেন ফারসী সাহিত্য-প্রীতির ফলে, কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণ পর্য্যন্ত সকলের দৃষ্টি পারস্য, বোখারা প্রভৃতি পশ্চিমের দেশের প্রতি নিবদ্ধ হইয়া যায়। তাই দেখিতে পাই, এই যুগের অনেক কাব্যে যদিও বাঙ্গালা দেশের রূপকথাকে বা গল্পকে কাব্যাকারে বর্ণনা করা হইতেছে, তথাপি কাব্যের পটভূমি বাঙ্গালা না হইয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহাতে লেখকের ভৌগোলিক জ্ঞানের এবং অনেক সময় সাধারণ বুদ্ধির অভাবে কাব্যের বর্ণিত বিষয় একেবারে খেলো হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। তথাপি, জোর করিয়া বলিতে পারা যায়, ফারসী সাহিত্যের প্রতি ইঁহাদের এহেন দরদ ও সম্প্রীতি থাকিলেও, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে, বিদেশীয় ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের পদে বিকাইয়া দিয়া, যে দেশে তাঁহারা স্থায়ীভাবে ছিলেন সেই দেশের ভাষা ও সাহিত্যকে (তাহা যতই না কেন নগণ্য হউক) কস্মিন্‌কালে অবমাননা করেন নাই। তাঁহাদের রচিত কাব্যগুলি, তাঁহাদের সমসাময়িক বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের রচিত কাব্যমালা হইতে নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুলিখিত। তাৎকালিক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুলিখিত ফারসী সাহিত্য তাঁহাদের আদর্শে পরিণত হওয়ায়, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া মানিয়া লইয়া, এই ভাষায় যে সকল কাব্য রচনা করেন, তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা-চিন্তাপরিপুষ্ট কাব্যাবলী হইতে অনেক বিষয়ে সুরুচিসম্পন্ন, চিত্তাকর্ষক, সুমধুর ও উন্নত-কাব্যকলা-কৌশলময় হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত না হইলে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের চিন্তাধারার পরিচয় লাভ, সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি, রস ও বৈচিত্র্যের অনুভূতি সম্বন্ধে যেমন সম্যক্ জ্ঞান জন্মিতে পারে না, তদ্রূপ ফারসী সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত না হইলেও, উপর্য্যালোচিত কাব্যাবলীর যাবতীয় রস ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। এই যুগের কাব্যাবলী যদি এই জন্যই বাঙ্গালীর নিকট সমাদর লাভ না করে, তবে এই দোষ বাঙ্গালী পাঠকের,—যুগধর্ম্মী কবিদের দোষ নহে।

ফারসী সাহিত্য প্রীতির ফলাফল।

সপ্তম অধ্যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সমাজ

এই অধ্যায়ে মুসলমান সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইতেছি, তাহা সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমানদের দ্বারা সৃষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য হইতেই সংগৃহীত হইল। সাহিত্য সমাজ বা জাতীয় জীবনের মুকুর স্বরূপ। পৃথিবীর কোন সাহিত্যই ধর্ম্ম, সভ্যতা, দেশ ও সমাজকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না, অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত পারে নাই। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। যে দেশে যেরূপ মানুষ বাস করে, সে দেশে অনুরূপ সমাজ গঠিত হয়। সমাজ লইয়া জাতি গঠিত ও জাতি হইতেই সভ্যতার উৎপত্তি। সুতরাং, মানুষের সৃজিত সাহিত্যে তাহার ধর্ম্ম, সভ্যতা, দেশ ও সমাজের প্রভাব না থাকিয়া পারে না। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী মুসলমান যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহাদের দেশ, সভ্যতা, ধর্ম্ম ও সমাজের ছায়া পড়িয়াছে। এই সময়ে তাহাদের সৃষ্ট সাহিত্যে তাঁহাদের সমাজের যে ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, বর্ত্তমান অধ্যায়ে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই যুগের মুসলমান সমাজের যে চিত্র তাঁহাদের সাহিত্য হইতে লাভ করিতেছি, তাহা খুব আনন্দ-দায়ক নহে। আধুনিক বাঙ্গালী মুসলমানদের অনেকেই খুব সম্ভব তাঁহাদের প্রাচীন সমাজের এই চিত্র দেখিয়া মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না; কিন্তু ইহাতে মুসলমানদের দুঃখিত বা লজ্জিত হইবার কোন কারণ দেখি না। কেননা, সমসাময়িক যুগের অন্য সমাজের চিত্রও ইত্যাধিক নিরানন্দ-দায়ক দেখা যায়। সুতরাং, এই যুগের মুসলমান সমাজে যদি বর্ত্তমান দৃষ্টিতে (ঐতিহাসিক প্রাচীন বিষয়ের প্রতি এইরূপ বর্ত্তমান দৃষ্টিতে দেখা উচিত নহে) কোন প্রকার দোষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, সে দোষ তখনকার মুসলমান সমাজের একার নহে।

বর্ত্তমান অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয়

গোড়াইতে বলিয়া রাখা ভাল,—আমরা এই যুগের মুসলমান সমাজের যে চিত্র লাভ করিতেছি, তাহা প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমান সমাজেরই চিত্র; কেননা এই চিত্র পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সাহিত্য হইতেই সংগৃহীত। সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানেরা কোন উল্লেখ যোগ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি করেন নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা; কেননা, এ যাবৎ বাঙ্গালার ঐ দিক হইতে মুসলমানদের এমন কোন প্রাচীন সাহিত্য আবিষ্কৃত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ, পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ হইতে ইসলামী আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে উন্নত। ইহার একমাত্র কারণ পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের সহিত অতি প্রাচীন কাল হইতে আরবদের সংস্রব ছিল। ইহার সামান্য প্রমাণ, প্রথম অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। অতএব উন্নততর পূর্ব্ববঙ্গীয় সাধারণ মুসলমান সমাজের যে চিত্র আমরা লাভ করিতেছি, অনুন্নত পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজের অবস্থা ইহার চেয়ে যে অধি-

পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলীম সমাজ

কতর শোচনীয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজের পার্থক্য বিস্তর; মুসলমান ধর্ম্ম ও সভ্যতার অনেক বিষয় এখনও পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমানের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বস্তু।

আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সে যুগের পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ শুধু ইস্‌লামী শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতায় পূর্ব্ববঙ্গীয় সাধারণ মুসলমান সমাজ হইতে অনুন্নত ছিল বলিয়াই যে

পশ্চিম বঙ্গের খিচুড়ী বাঙ্গালা।

নানা বিষয়ে পৃথক ছিল এমন নহে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে এই যুগে ভাষাগত একটি প্রধান প্রভেদ বিদ্যমান ছিল। আমরা দেখিতে পাই, পূর্ব্ববঙ্গের "বাঙ্গাল" মুসলমানেরা যে যুগে (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ কি তাহার ও কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে) বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়া এই ভাষা চর্চ্চার মধ্য দিয়া, একটা বিরাট জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, সেই যুগের পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান নিদ্রিত। উত্তর বঙ্গের মুসলমানেরা ইহার একটু পরবর্ত্তী কাল হইতে (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন;—ইহার কিছু কিছু প্রমাণ আমাদের নিকট আছে। আরও দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন মুসলমান জননায়ক সরকারী আইন সাহায্যে বাঙ্গালী মুসলমানের ঘাড়ে উর্দ্দুর মামদো ভূত চাপিয়া দিতে প্রয়াসী। উড়িয়াও সাঁওতাল ভাষার দ্বারা প্রভাবিত পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমানদের প্রাচীন কাল হইতে এহেন উর্দ্দু প্রীতি বোধ হয়, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতেও একটি ভাষাগত প্রভেদ আমদানী করিয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের উর্দ্দু প্রীতির ফলে এই যুগে তাহাদের বাঙ্গালা ভাষা উর্দ্দু মিশ্রিত হইয়া ইহার স্বাভাবিক শক্তি হারাইয়া ফেলিতে এবং ধীরে ধীরে না-উর্দ্দু না-বাঙ্গালা এমন একটি শক্তিহীন ও দুর্ব্বল জগাখিচুড়ী ভাষায় পরিণত হইতে বাধ্য হয়। তাহার প্রমাণ আমরা এই যুগের পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গীয় দুইজন খ্যাতনামা মুসলমান কবির একই বিষয় লইয়া লিখিত পুস্তকের ভাষায় স্পষ্ট দেখিতে পাই। কবি **মোহাম্মদ খান** (১৬৪৬ খ্রীঃ জীবিত) পূর্ব্ববঙ্গের কবি। তাঁহার একটু পরবর্ত্তী সময়ে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ-পরগণা জেলার বালিয়া পরগণার অন্তর্গত জীরিকপুর গ্রামে **মোহাম্মদ এয়াকুব** নামক আর একজন মুসলমান কবি জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ১১০১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "জঙ্গনামা" রচনা করেন (১)। মোহাম্মদ খানের "মক্‌তুল্ হোসেন" ও মোহাম্মদ এয়াকুবের "জঙ্গনামা" একই বিষয় অর্থাৎ কারবালার ঘটনা লইয়া ফারসী "মক্‌তুল হোসেন"-এর ছায়াবলম্বনে লিখিত। উভয় কবির কাব্য হইতে, ইমাম হোসেনের "শাহদৎ" বা ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মহুতি লাভের পরবর্ত্তী বিষাদময় অংশ হইতে পাশাপাশি মাত্র দশটি শ্লোক তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

মোহাম্মদ খান।	মোহাম্মদ এয়াকুব।
"স্বর্গ মর্ত্য পাতালে উঠিল হাহাকার।	"**আরস, কোরস, লওহ** ও **কলম** সহিতে।
কান্দন্ত **ফিরিস্তা** সব গগন মাঝার॥ (১)	**বেহেস্ত দোজখ** আদি লাগিল কাঁপিতে॥ (১)

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৪ বাং, ২য় সংখ্যা, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী লিখিত "জঙ্গনামা" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১২৩-১৩৮।

বিলাপন্ত জথেক গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
'আর্স, কুর্সি, লহু আদি কাঁপে থর থর ॥ (২)
অষ্ট স্বর্গবাসি জথ করন্ত বিলাপ।
ধিক্ ধিক্ কুফি সৈন্য অধার্ম্মিক পাপ ॥ (৩)
এ সপ্ত আকাশ হৈল লোহিত বরণ।
কম্পমান সূর্য্য দেখি হোছেন নিধন ॥ (৪)
খিন হৈল নিসাপতি আমিরের সোকে
মঙ্গল অরুণ বর্ণ রক্ত মাখি মুখে ॥ (৫)
বুধে বুদ্ধি হারাইল গুরু এড়ে জ্ঞান।
সনি কালা বস্ত্র পিন্ধে পাই অপমান ॥ (৬)
জোহরা নক্ষত্র কান্দে তেজি নাট গীত
ফাতেমা-জোহরা দেবি সোকে বিসাদিত ॥ (৭)
সমুদ্রে উঠিল ঢেউ পরসি আকাস।
কম্পিত পর্ব্বত ছাড়ে সঘন নিস্বাস ॥ (৮)
কম্পমান পৃথিবি জথেক চরাচর।
হইল সোণিতবর্ণ দিগ দিগান্তর ॥ (৯)
জল তেজে মিনগণে পক্ষি তেজে বাসা।
সব কান্দে হাসএ ইব্লিছ অনা আশা ॥ (১০)

আসমান জমিন আদি পাহাড় বাগান।
কাঁপিয়া অস্থির কৈল কারবালা ময়দান ॥ (২)
আস্তাব মাহতাব আদি কালা হইয়া গেল।
জানওয়ার হরিণ পাখি কান্দিতে লাগিল ॥ (৩)
বালক সকল মরে দুধ বে হইতে।
না-ওম্মেদ রহে সবে এমাম শোকেতে ॥ (৪)
বাঘ ভল্লু কান্দে আর মহীষ গণ্ডার।
বাচ্চায়ে না দেয় দুধ কান্দে জারে জার ॥ (৫)
গাই নাহি দুধ দেয় বাছুর লাগিয়া।
বাছুর না খায় কিছু শোক যে পাইয়া ॥ (৬)
মউমাছি ভোমর কান্দে মুখে নাই মউ।
কাকে কুম্ভ করে কান্দে গেরোস্তের বউ ॥ (৭
মালি ও মালিনী কান্দে এলো করে চুল।
হায় হায় এমাম গেল কারে দিব ফুল ॥
যত মোছলমান ছিল এজিদ লস্করে।
জার জার হৈয়া কান্দে এমাম খাতিরে ॥ (৯)
শোকেতে কাতর হৈল যত মোছলমান।
দেলেতে হৈল খুসি যত কুফরান ॥ (১০)

উপর্য্যুদ্ধৃত দশটি শ্লোকের ভাষা তুলনা করিলে দেখা যাইবে, এয়াকুব যে শুধু মোহাম্মদ খানের নিকট কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্যে দাঁড়াইতে পারেন না এমন নহে, বরং তাঁহার ভাষা মেরুদণ্ডহীন খিচুড়ীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মোহাম্মদ খানের দশটি শ্লোকে মাত্র নয়টি ফারসী শব্দ আছে; তাহাও আবার নাম বা পারিভাষিক শব্দ; আর মোহাম্মদ এয়াকুবের দশটি শ্লোকে মোট একত্রিশটি ফারসী ও উর্দ্দূ বা হিন্দী শব্দ রহিয়াছে, তাঁহার মধ্যে মাত্র কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়া আর অনেকগুলি শব্দই অনাবশ্যকীয় আমদানী। এই আমদানীতে তাঁহার ভাষার দীনতাই সূচিত হয়;— সম্পদ বৃদ্ধি হওয়া ত দূরের কথা।

পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালা প্রীতি।

পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের হাতে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষা যখন এইরূপ মেরু-দণ্ডবিহীন হইয়া ক্রমশঃ দুর্গতির চরম সীমার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, (ইঁহাদের হাতে বাঙ্গালা ভাষা দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছে তাঁহাদের দ্বারা রচিত উনবিংশ শতাব্দীর পুথীতে) তখন পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গীয় মুসলমানদের হাতে বাঙ্গালা ভাষা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। পূর্ব্ববঙ্গে এই যুগের অন্ততঃ দুই শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষা সাধারণ মুসলমানদের মাতৃভাষারূপে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু কোন কোন বিদেশাগত বা উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান তখনও বাঙ্গালা ভাষাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না বলিয়া বোধ হয়; মোল্লা সমাজ এই ভাষার বিপক্ষে "ফতোয়া" দিতেন বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ইঁহারা পুরুষ

পরম্পরাগতভাবে এ দেশে বাস করিলেও এ দেশীয় ভাষার প্রতি এহেন ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন বলিয়া, আমাদের কবি **আবদুল হাকিম** (পূর্ব্ব অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তাঁহার "নূর নামা" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে কড়া ভাষায় শ্লেষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুধু পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমানদের বঙ্গভাষা-প্রীতি ঘোষণা করিতেছে না. বরং এখনও যাহারা বাঙ্গালী মুসলমানদের ঘাড়ে উর্দ্দুর মাম্‌দো ভূত চাপাইতে চাহেন, তাঁহাদের অদ্ভুত মানসিকতাকেও ইহা বিজ্ঞ-জনোচিত বিদ্রূপ করিতেছে। তিনি বলেন,—

"জে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণি। সে সব কাহার জন্ম নির্ণএ না জানি॥
দেসি ভাসা বিদ্যা জার মনে না জুয়াএ। নিজ দেশ তেআগী কেন বিদেসে না জাএ॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি। দেসি ভাসা উপদেস মন হিত অতি॥"

(ন্যূনাধিক পৌনে দুইশত বৎসরের হস্তলিপি হইতে উদ্ধৃত)

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজে এবম্প্রকারের যে ভাষাগত প্রভেদ ছিল, তাহা অপরাপর সামাজিক বিষয়েও ছিল,—এইরূপ মনে করিবার কারণ অমূলক নহে। মোটকথা, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ হইতে সাহিত্য সাধনায়, ইস্‌লামী শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও সভ্যতায় অনেকাংশে পৃথক ছিল। এই পার্থক্য পূর্ব্ববঙ্গের পক্ষে শ্রেষ্ঠতার এবং পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে হীনতার পার্থক্য। ইস্‌লামী শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে এই যে প্রভেদ, ইহার কারণ,—পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ ইস্‌লামকে লাভ করিয়াছিল, সোজা আরবদের নিকট হইতে, আর পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মুসলমান সমাজ ইহাকে লাভ করিয়াছিল, দ্বিতীয় হাতের মধ্যস্থতায় অর্থাৎ পাঠান, মোঘল এবং সর্ব্বোপরি উত্তর ভারতীয় দরবেশদের হাত হইতে। ইস্‌লাম্ প্রাপ্তির এহেন তারতম্যের ফলে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যেও এহেন ইস্‌লামী সভ্যতামূলক তারতম্য দেখা দিয়া থাকিবে।

এ সকল কথা আর অধিক বলিয়া কাজ নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ মোট পাঁচ প্রকারের লোক লইয়া গঠিত হয়. যথা—সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মোঘল, বাঙ্গালী। হিন্দুর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের ন্যায়, মুসলমান সমাজের এই জাত-বিভাগ তাঁহাদের আচরিত ব্যবসায় অনুসারে ছিল না, ইহা ছিল প্রধানতঃ দেশের অধিবাসীর প্রাচীন বাসস্থান সম্পর্কিত নাম হিসাবে। সৈয়দেরা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কন্যা পক্ষীয় অধস্তন পুরুষ—সুতরাং তাঁহারা একটু স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য্য। আরবের ধনী ও বণিকগণ পূর্ব্বে যেমন এখনও তেমন "শেখ" উপাধি বহন করিতেছেন। তুর্কীস্থানের অধিবাসীরা এদেশে "পাঠান" নামে পরিচিত হইয়া যায়। মোঘলেরা মধ্য এশিয়া হইতে এদেশে আসেন। এই যে বিদেশাগত লোক, ইঁহারা যদিও পুরুষ পরাম্পরায় বাঙ্গালা দেশে বাস করিয়া আসিতেছিলেন, তথাপি ইঁহাদের অনেকেই বাঙ্গালা দেশের পরিচয় দিতেন না, বা পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেন। এখনও কলিকাতা অঞ্চলের এক শ্রেণীর মুসলমান হিন্দুদিগকে "বাঙ্গালী" নামে অভিহিত

পাঁচ প্রকারের লোক লইয়া মুসলমান সমাজ গঠিত।

করিয়া থাকেন, যেন তাঁহারা "বাঙ্গালী" বা বাঙ্গালার অধিবাসী নহেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া যাঁহারা মুসলমান সমাজভুক্ত হইয়া পড়েন, পূর্ব্ববঙ্গের কথা বাদ দিয়া (কেননা এখানে ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারী মুসলমানদের চেয়ে বিদেশাগত মুসলমানের সংখ্যা অনেক অধিক ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়) পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে, বাঙ্গালার সাধারণ মুসলমান সমাজ ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারী অর্থাৎ নব দীক্ষিত মুসলমানকে লইয়া গঠিত হয়। এই নবদীক্ষিত মুসলমানগণ পশ্চিমবঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে—জানিনা কাহাদের কারসাজিতে—"শেখ" বা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়েন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ চট্টগ্রাম বিভাগে, "শেখ" আখ্যা দ্বারা উচ্চশ্রেণীর মুসলমানই বুঝাইয়া থাকে। এই জন্য, এই অঞ্চলে অল্প সংখ্যক সৈয়দ, পাঠান ও মোঘল ব্যতীত অপরাপর সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা "শেখ" আখ্যা গৌরবের সহিত ব্যবহার করিতে দেখা যায়। অল্প সংখ্যক সৈয়দ, শেখ (পশ্চিম বঙ্গের "শেখ" নহেন) পাঠান ও মোঘল ব্যতীত অপরাপর অধিকাংশ মুসলমানকে আমরা "বাঙ্গালী" নামে অভিহিত করিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সমাজ যদিও বিদেশাগত মুসলমানের দ্বারা গঠিত হয়, তথাপি এই অঞ্চলের মুসলমানেরা পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ গৌড়ে স্থাপিত মুসলমান রাজ্যের বা রাজার বড় একটা ধার ধারিত না। ব্যবসা-বাণিজ্য বা কৃষিই ইঁহাদের প্রধান সম্বল ছিল। বাঙ্গালার মুসলমান রাজসরকারের বড় "তোয়াক্কা" রাখিত না বলিয়াই, এই অঞ্চলের মুসলমানেরা ফারসী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বা তাহা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে প্রাচীন কাল হইতেই মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাই, এই অঞ্চলের প্রাচীন মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই সৈয়দ, কাজী, সিদ্দিকী ইত্যাদি সম্মানসূচক আখ্যাধারী ব্যক্তি রহিয়াছেন।

যেরূপই হউক, সৈয়দ, শেখ, পাঠান ও মোঘলেরা সম্ভ্রান্ত মুসলমান ছিলেন ; তাঁহারা রাজসভায় সসম্মানে স্থান পাইতেন :—

"নানা জাতি লোক সবে ধরিল জোগান ; সভাতে বসিলা শ্রীআসরফ খান ॥
সৈয়দ, সেখজাদা আদি মোঘল, পাঠান। স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান ॥

সতী ময়না—দৌলত কাজী

এই চারি শ্রেণীর মুসলমান ব্যতীত, অন্য কয়েক শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানও সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিতেন। এই শিক্ষিত শ্রেণীর, "কাজী" অর্থাৎ বিচারক শ্রেণী, "মোল্লা" অর্থাৎ ধর্ম্মযাজক শ্রেণী "আলিম" (বহুবচনে "ওলমা") অর্থাৎ আরবী শিক্ষিত শ্রেণী, "ফকীর" অর্থাৎ সাধক শ্রেণী প্রভৃতিও লোকের কাছ হইতে সম্মান পাইতেন। ইঁহারা সাধারণ মুসলমান সমাজে নানা প্রকারের জ্ঞানসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ে (learned profession) নিযুক্ত ছিলেন। দৌলত কাজী ও আলাওলের কাব্য হইতে আমরা সমাজের এই অবস্থা জানিতে পারি। দৌলত কাজী বলেন, তাঁহার আশ্রয়দাতা আশরফ খান—

মুসলমান সমাজের সম্মানিত শ্রেণী।

"সৈয়দ, কাজী, সেখ, মোল্লা, আলিম ফকির।
পুজেন্ত সে সবে জেন আপনা শরীর" ॥

আলাওল তাঁহার আশ্রয়দাতা মাগণের গুণ কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলেন ঃ—

"ওলমা, সৈয়দ, সেখ, যথ পরবাসি। পোষেন্ত আদর করি বহু স্নেহবাসি ॥
কাহাকে খতিব, কাকে করেন্ত ইমাম। নানাবিধ দানে পুরায়েন্ত মনস্কাম ॥ (পদ্মাবতী)

এই যুগে বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজে উত্তর ভারতীয় স্বূফীমতবাদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। এই সময়ে যদিও উত্তর ভারতীয় স্বূফী-সম্প্রদায় চতুর্দ্দশ "খান্দানে" অর্থাৎ শাখায় বিভক্ত ছিল, তথাপি সাধারণভাবে চারিটি "খান্দানই" স্বীকৃত হইত; ইহারা, চিশ্‌তী, স্থহর্‌ওয়ার্দী নক্‌শবন্দী ও কাদেরী। বাঙ্গালী মুসলমানেরা এই চারিটি "খান্দানের" কোন-না-কোন এক "খান্দান"ভুক্ত ছিলেন। এহেন স্বূফী "খান্দান"ভুক্ত হওয়াকে বাঙ্গালী মুসলমানেরা যে কেবল গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন এমন নহে, বরং ইহাকে ধর্ম্মের একটি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কবি আলাওল রোসাঙ্গের কাজীর নিকট হইতে "কাদেরী খান্দানে" দীক্ষা গ্রহণ করেন, আর দৌলত কাজীর আশ্রয় দাতা—

বাঙ্গালী মুসলমানের উপর স্বূফী প্রভাব।

"মুখ্যপাত্র শ্রীযুতআসরফ খান।
হানাফি মোজাব ধরে চিস্তির খান্দান ॥"

এহেন স্বূফী প্রভাবের ফলে, ইহার আনুষঙ্গিক বিধানরূপে, বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে, এই সময়ে পীরপূজার বহুল প্রচলন হয়। এই পীরপূজা ও হিন্দুর গুরুবাদে কোন প্রকারের প্রভেদ ছিল না। পীরদের হাতে দীক্ষা গ্রহণ করাকে মুসলমানগণ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বিশ্বাসে পরিণত করে। পীরগণ "মুর্শিদ" বা পরমার্থ পথদ্রষ্টা নামে সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন। তাঁহাদের ভক্ত শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে ভগবানের জাগতিক প্রতিনিধি ও "মা'রফত" বা তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, "মুর্শিদ" বা পীরকে পূজা করিলে, হৃদয়ের যাবতীয় অজ্ঞানতা অন্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হয়, পরলোকে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং শরীর পবিত্রিকৃত ও বিশুদ্ধ হয় ঃ—

পীরপূজা।

"কায়া সুদ্ধ হয় জান মুর্সিদ ভজিলে। লাঠি লৈক্ষ্যে চলে যেন আন্ধিআল সকলে ॥
মুর্সিদ প্রসাদে হয় আঁখির প্রকাশ। মিহির কিরণে জেন উজ্জল আকাশ ॥"
(মল্লিকার হাজার সওয়াল—সেরবাজ।)

এহেন অনৈস্‌লামিক বিশ্বাসের (সংস্কার ভাবাপন্ন মুসলমানদের মতে অনৈস্‌লামিক) ফলে পীরবাদ দেশে এমনই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, বোধ হয়, বাঙ্গালায় এমন কোন মুসলমান ছিলেন না, যিনি কোন-না-কোন পীরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে দেশে পীরের সংখ্যাও যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। তাই আমরা দেখিতে পাই, এই যুগের মুসলমান কবিদের প্রায় প্রত্যেকেই কোন-না-কোন পীরের চরণ ধ্যান করিয়া কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যদিও কবিগণ তাঁহাদের পীরের গুণ কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ, তথাপি ইঁহাদের কেহই খ্যাতনামা সাধু পুরুষ ছিলেন না; কেননা, এই সাধুত্বের মুখোস পরিহিত পীরগণের সকলের নাম ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই যুগের মুসলমানেরা যে শুধু পীরপূজার দ্বারা শাস্ত্রীয় ইস্‌লাম্‌ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছিলেন

এমন নহে, তাঁহাদের ভিতর অনেক হিন্দু বিশ্বাস ও ক্রিয়া করিত। এই সমুদয় বিশ্বাসের মধ্যে "পীর বা মুর্শিদ"বাদে গুরুবাদের প্রভাব এত সুস্পষ্ট যে, তাহা বলার প্রয়োজন নাই।

পুনর্জ্জন্মবাদ।

কর্ম্মফল ভোগ বা পুনর্জ্জন্ম বাদেও যে এই সময়ে মুসলমানেরা বিশ্বাস করিতেন, ইহাই আশ্চর্য্য। মুসলমানেরা অদৃষ্টবাদ মানে; কিন্তু বর্ত্তমান জীবনে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ মানে না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহারা (অন্ততঃ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই) বিশ্বাস করিতেন ঃ—

"দেখ দেখ জার জেই আছে কর্ম্মভোগ।
সেই মত কর্ম্মফলে ভুঞ্জে দুখ-সুগ॥"

(নছিরা নামা—মরদন)

এই সময়ে বিবাহ-ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধান বড়ই শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। মোঘল-আমলের প্রথম যুগ হইতেই হিন্দু-মুস্‌লিম্ অন্তর্জাতিক বিবাহের বহুল প্রচলন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে এহেন অন্তর্জাতিক বিবাহ অর্থাৎ মুসলমান কর্তৃক হিন্দু রমণীর পাণিগ্রহণ করা একটি "ফ্যাসান" বা রীতিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই যুগের প্রায় কাব্যে হিন্দু নায়িকার জন্য মুসলমান নায়ক এবং মুসলমান নায়কের জন্য হিন্দু নায়িকা প্রেমোন্মত্ত—ইহার কারণ কি? এখানে কি যুগধর্ম্মের ছায়া পড়ে নাই? আশ্চর্য্যের বিষয়, এই নায়িকার মিলনের পর যখন বিবাহ হয়, তখন কোন দিক হইতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রশ্ন উঠে না, যেন হিন্দু নায়িকা মুসলমান নায়কের জন্য "কেতাবীয়া" অর্থাৎ খ্রীষ্টান কি ইহুদীর ন্যায় ঐশী বাণীপ্রাপ্ত জাতির মহিলা, অথবা মুসলমান নায়ক হিন্দু নায়িকার জন্য অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ বা যবন নহে। এহেন অসম ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বিবাহে বিনাপত্তিতে "কাজীজী" আসিয়া "শরা-পড়াইয়া" অর্থাৎ মুসলমান শাস্ত্রীয় বিবাহ-মন্ত্র পাঠ করাইয়া দেন, অথচ তিনিও নায়িকাকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইয়া পরে "শরা-পড়াইবার" কথা তোলেন না। তাই দেখিতে পাই, চামরী-রাজ সোলতান শাহের সহিত যখন রতিকলার বিবাহ হওয়া স্থির হইল, তখন

বিবাহ-ব্যাপারে ইসলামী শাস্ত্র বিধানের শিথিল প্রয়োগ।

"কাজি সাজি সিঘ্র আসি, সরা পড়াইল বসি
মনে ভাবি প্রভু করতার।" (জেবল মুলুক-শামারোখ—সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর)

কাজী সাহেব ত শীঘ্র সাজিয়া আসিয়া মনে মনে প্রভু করতার ভাবিয়া "শরা পরাইয়া" দিলেন, কিন্তু রতিকলা, ধর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে, নামে রতিকলাই রহিয়া গেলেন। এই যুগের আরও অনেক হিন্দু নায়িকার বিবাহ-ব্যাপারে মুসলমান শাস্ত্র শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগকে মুসলমানগণ "কিতাবীয়া" শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

বিবাহ-ব্যাপারে এবং এবংবিধ আরও অনেক বিষয়ে, ইসলামী শাস্ত্রের শিথিল প্রয়োগ হইত। বাঙ্গালা দেশের সমাজে যে সকল প্রথা, আমোদ, প্রমোদ প্রচলিত ছিল, মুসলমান সমাজেও তাহার অনেকগুলি বর্ত্তমান ছিল। এই সকল বিষয়ে মুসলমানগণ শাস্ত্র অপেক্ষা দেশকে অধিক শক্ত করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন। নিম্নে আমরা এহেন কতিপয় দেশীয় আমোদ, প্রমোদ ও প্রথার কথা উল্লেখ

করিতেছি। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে ইহার কতকগুলি এখনও প্রচলিত আছে,— যথাস্থানে আমরা তাহার উল্লেখ করিব।

বিবাহের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে নানাবিধ আমোদ প্রমোদ ও হাসি ঠাট্টার মধ্যে কনেকে গৃহের বাহিরে আনিয়া স্নান করাইবার প্রথা পূর্ব্বে যেমন এখনও তেমনভাবে বঙ্গের মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে। এই সময়ে মেয়ে মহলে যে সকল আমোদ, প্রমোদ ও হাসি-ঠাট্টা চলে, স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এখন তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইলেও, তাহা একেবারে লোপ পায় নাই। কবি দোনা গাজী চৌধুরী তাঁহার "সয়ফুল মুলুক ও বদিউজ্জমাল" কাব্যে কনের স্নানের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান ও আমোদ প্রমোদের যে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

কনের স্নানের আনুষঙ্গিক আমোদ প্রমোদ।

"অন্তসপুরে নারিগণে, আজ্ঞা পাই সুবৈক্ষণে
মঙ্গল করএ সুভধনি।
ঘৃতের ডিঅটি হাতে, সুবর্ণ কলসি মাথে,
দাণ্ডাইল রূপসি কামিনি॥
কেহ নাচে, কেহ হাসে, কেহ গীত গাহে রসে,
কেহ করতালি মনরঙ্গ।
কার হাতে জল ঘটি, কার অঙ্গে মারে তুলি,
কেহ ঠমকে অঙ্গ ভঙ্গ॥
কেহ পান গুয়া খাএ, আনন্দে ধামালি গাএ
কতুকে করএ নানা কেলি।
আড়েত লুকাই পাসে, কেহ কার পরে হাসে,
ফেলাএ কাহার অঙ্গে ঠেলি॥
আগর-চন্দন-চুআ, কর্পুর-তাম্বুলগুআ,
কেহ কারে হরিসে জোগাএ।
গোলাপের জল ঝারি, সোহাব মেলিআ মারি,
কেহ কার বসন তিতাএ॥
কেহ রঙ্গে হুড়াহুড়ি, কেহ ঢঙ্গে জড়াজড়ি,
কেহ কাকে ফেলাএ ঠেলিআ।
কেহ অতি বেস্ত গতি, অঙ্গে করে নানা ভাতি,
রস রঙ্গ কতুক ভুলিআ॥
কতুকে জথেক পরি, সুবর্ণ কলসি ভরি,
চলিআ জাইল অন্তসপুরে।
রাজ কন্যা কোলে করি, আনন্দে জথেক পরি,
বাহের করিল ধিরে ধিরে॥

স্ববর্ণ পাটেত রাখি, অঙ্গেত স্থগন্ধি মাখি
আনন্দে গাহেন্ত সবে গীত।
কেহ করি পরিহাস, খোসাএ অঙ্গের বাস,
কেহ নাচে হই আনন্দিত॥

* * *

অথ সোহাগিনি মিল, করিআ নানান কেলি,
সেয়ান করাইলা রাজস্থতা॥"

উপর্য্যুদ্ধৃত অংশে দেখা যায়, কনেকে স্নান করাইবার আজ্ঞা পাওয়া গেলেই অন্তঃপুরে মেয়েরা মঙ্গলসূচক শুভধ্বনি করিত (সম্ভবতঃ ইহা হুলুধ্বনি বা তদনুরূপ কোন মঙ্গল ধ্বনি), হাতে প্রদীপ লইত, মাথায় কলসী বহিত, নাচিত, হাসিত, গান (ইহা এখনও পূর্ব্ববঙ্গে সহলা = হঅলা = হ'লা বা মেয়েলী গান নামে পরিচিত) করিত, করতালি দিত, ঘটি হইতে জল লইয়া সিঞ্চন করিত, পান-সুপারির শ্রাদ্ধ করিত, আনন্দে "ধামালী" (অশ্লীল গান) গাহিত, নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত হইত, অগুরু, চন্দন, চূয়া, কর্পূর প্রভৃতি সুগন্ধি অঙ্গে মাখিত, "গোলাব-পাশ" হইতে গোলাব-জল সিঞ্চন করিত। তারপর অন্তঃপুর হইতে সকলে মিলিয়া কনেকে বাহিরে আনিয়া একটি "পাট" বা পিঁড়ীতে বসাইয়া দিত, এবং কলসীর জল দিয়া নানাবিধ হাস্য-পরিহাস সহকারে স্নান সমাধা করিত। স্নান-সমাপনান্তে কনেকে সুবাসলিপ্ত করা হইত ও তাহার হস্তপদকে "মেহেদী"র দ্বারা রঞ্জিত করিয়া দেওয়া হইত :—

"মেন্দি দেএ হাতে পাএ, স্থগন্ধি মাখিআ গাএ
পবিত্র বসনে মে'ছে অঙ্গ॥" (দোনাগাজী)

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সমাজে ব্যবহৃত অলঙ্কার

এই যুগে আমাদের সীমন্তিনীরা যে সকল অলঙ্কার পরিধান করিতেন, তাহার অধিকাংশ অলঙ্কার এখনও প্রচলিত আছে। দেশে ইউরোপায় সভ্যতা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে যেমন পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, সমাজের নানা স্তরেও পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। কিন্তু এ পরিবর্ত্তন পুরুষ মহলে যত বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, স্বভাবতঃই রক্ষণশীল বলিয়া মেয়ে মহলে তত নহে। সুতরাং অলঙ্কার ব্যবহারে বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ এখনও বেশীর ভাগ সপ্তদশ শতাব্দীতেই বাস করিতেছে। সে যাহা হউক, এই যুগে মুসলমান সমাজে যে-সকল অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত, তাহার একটি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। পাদটীকায় এই যুগের মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে মেয়েদের অলঙ্কার সম্বন্ধে কয়েক স্থল উদ্ধৃত করা হইল (১) ; উদ্ধৃত স্থল কয়টি এক সঙ্গে মিলাইয়া পাঠ করিলে এই যুগের অলঙ্কার সম্বন্ধে আমরা যে সকল কথা লিখিতেছি, তাহা জানিতে পারা যাইবে।

*

১। (ক) "স্ববর্ণ শোভিত চাম্পাফুল।
শোভিছে কর্ণের পাতি, পুষ্প খোপা নানাজাতি,
কনকের ঝারকা বহুল॥—(পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বোলি বা বালি—ইহা কর্ণে ব্যবহার করিবার উপযোগা বৃত্তাকার অলঙ্কার বিশেষ। কর্ণের বহিঃপ্রান্তে ঘন ঘন ছিদ্র করিয়া, প্রত্যেক ছেদায় সরু সরু আংটির ন্যায় এক একটি "বালি" এখনও বাঙ্গালার মুসলমান নারীরা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ঝরকা- আধুনিক "ঝুম্‌কা" নয় কি? নতুবা এই জাতীয় কোন প্রকারের কর্ণভূষণ হইবে,—সন্দেহ নাই।

কর্ণফুল—ইহা অর্দ্ধবৃত্তাকার ক্ষুদ্র বাটির ন্যায় কর্ণের অলঙ্কার। ইহার বহিঃপ্রান্তে ঝালর থাকে। কর্ণের অধঃস্থিত নরম অংশটুকুতে অর্থাৎ কর্ণমূলে ছিদ্র করিয়া ইহা তথায় পরিধান করিতে হয়। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে ইহার ব্যবহার আছে।

লোলক, দুল—ইহাও কর্ণের অলঙ্কার; কর্ণফুলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। "লোলক" বা "নোলক" এখন দুই নাসারন্ধ্রের মাঝখানে ব্যবহৃত হয় এবং দুল এখন কর্ণের শোভা বর্দ্ধন করে।

পিপলিপাত—ইহা "বোলি" বা "বালি"র আনুষঙ্গিক অলঙ্কার। ইহা "বোলির" সহিত ঝালরের ন্যায় দুলিয়া থাকে। এখন কদাচিত ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

বেশর—ইহা দুই নাসারন্ধ্রের মাঝখানে এখন ও পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। ইহা "নোলক" জাতীয় অলঙ্কার।

মাছিপাত—ইহাও "নোলক" এবং "বেশর" জাতীয় নাসালঙ্কার। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে ইহার আদর একেবারে তিরোহিত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন পরিবারে এখনও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

নৎ- ইহা বৃত্তাকার বৃহৎ নাসালঙ্কার বিশেষ। বাম নাসারন্ধ্রের অধঃস্থ নরম অংশটুকুতে ছেদা করিয়া আংটির ন্যায় এই বৃহৎ স্বর্ণ-বৃত্ত নাসিকায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইত এবং একটি সরু স্বর্ণ-শৃঙ্খল সাহায্যে বাম কর্ণের সহিত বাঁধিয়া রাখা হইত। বাঙ্গালা দেশে এখন ইহার ব্যবহার নাই। পশ্চিমা মেয়েদের নাকে এখনও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

গজমতি, তেলরী, ছলরী—ইহারা গলায় ব্যবহার করিবার হার বিশেষ। ইহাদের মধ্যে "গজমতি" হারই প্রাচীন কালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। "তেলরী" হারে তিনটি লতা ও "ছলরী"

* * *

কর্ণে শোভে কর্ণফুলা, হাতে শোভে ছাকি বৈলা,
তার, বাহু, বেশর শোভন।
সির খাড়ুয়া পাএ, অগুরু চন্দন গাএ,
ভ্রমর গুঞ্জরে চারি ধার।
কোমরে কিঙ্কিনী বাজা, হৃদয়ে মাণিক্য ছাজা
গলে শোভে গজমতি হার।

(জেবল মুলুক শামারোখ)

হারে ছয়টি লতা থাকিত। এখন এবংবিধ হার ব্যবহার করিবার নিয়ম না থাকিলেও, নানা প্রকারের হার ব্যবহার করিবার প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে।

তার—ইহা চারি ইঞ্চি দীর্ঘ চোঙ্গার ন্যায় বাহু বেষ্টনী অলঙ্কার বিশেষ। এখনও কোন কোন স্থানে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার বহুল প্রচলন ছিল।

তোড়ল—ইহা ডিম্বাকৃতি সম্পন্ন অর্দ্ধ বাহু বেষ্টনী অলঙ্কার বিশেষ। এখনও ইহা কোন কোন হিন্দুপরিবারে ব্যবহৃত হয়। পুরুষেরাও ইহা ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

বাজুবন্ধ—ইহাও বাহু বেষ্টনী অলঙ্কার। ইহার দুই প্রান্ত যেখানে মিলিত হয়, তথা হইতে একটি পুষ্পঝার সদৃশ লম্বমান ঝার ঝুলিয়া থাকে। ন্যূনাধিক বিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার বহুল প্রচলন ছিল।

বলয়—বলয় বা বালার পরিচয় বর্ত্তমান যুগে অনাবশ্যক। এখন যেমন নানাবিধ বালার ব্যবহার দেখা যায়, পূর্ব্বেও তেমন ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে; তবে তন্মধ্যে "অঙ্গদ বলয়"ই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকিবে।

পহচী বা **পৈঁচী**—ইহা হাতের কব্জীর উপরিভাগে ব্যবহার করিবার উপযোগী অলঙ্কার বিশেষ। এখনও চট্টগ্রাম বিভাগে ইহার প্রচলন আছে।

(খ) কানে বোলি কর্ণফুল, লোলক শ্রবণ তুল
সুবর্ণ পিপলিপাত দোলে।
* * *

কপালে সিন্দুর দিয়া, বেসর নাকেত দিয়া
সারি সারি উড়ে মাছিপাত।
তেলরি ছলরি হার, গ্রিবা অতি শোভাকার
মণি মুক্তা জড়ি মনুহর।
তার বাজুবন্ধ করে, অঙ্গদ বলয়া ধরে
পহচি কাঞ্চন শোভাকর।
হিরা মণি হেমা জড়ি, মদন মিশাই গড়ি
দিয়াছে বাহুটী বাজুবন্ধ।
* * *

কনিষ্ঠ আঙ্গুল মাঝে, সুবর্ণ অঙ্গুরি রাজে,
কাঞ্চন অঙ্গুরি শোভে করে।
* * *

কাটিতে কিঙ্কিনী ধ্বনি, চরণে নেপুর শুনি,
রুনুঝুনু বাজে সুললিত।
* * *

বাজুটি বা বাজু—ইহাও হাতের কব্জীর উপরিভাগে ব্যবহার করিবার উপযোগী চোঙ্গা-সদৃশ চারি-পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ অলঙ্কার বিশেষ। এখন ইহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

বৈলা—ইহাও হাতের কব্জীর উপরিভাগে ব্যবহার করিবার অলঙ্কার। ইহা নানাবিধ ছিল; তন্মধ্যে "ছাকি বৈলা"ই উৎকৃষ্ট ছিল। এখন ইহার ব্যবহার দেখা যায় না।

অঙ্গুরী—ইহার পরিচয় অনাবশ্যক।

কিঙ্কিনী—চলিবার সময় বাজিয়া উঠিবার জন্য ইহাকে কোমরে ব্যবহার করা হইত। ইহা আজকাল পূর্ব্ববঙ্গে "ঝুনঝুনী" নামে পরিচিত ও সাধারণতঃ ছোট ছোট ছেলে মেয়ের কোমরে সূতায় গাঁথিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

নূপুর, নেপুর—স্বনামখ্যাত পদভূষণ। গৃহস্থের বৌ-ঝিরা আজকাল নূপুর পরে না। রঙ্গ-মঞ্চের নর্ত্তকীদের চরণে ইহা দৃষ্ট হয়।

পাঞ্জব, পায়জব—ইহাও নূপুর শ্রেণীর এক জাতীয় পদভূষণ। পায়ের গোড়ালির উপরে আটকাইয়া পাতার দিকে ঝুলাইয়া পরিতে হয়। চলিবার সময় ইহা হইতেও রুনুঝুনু শব্দ উঠে। ইহার ব্যবহার এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

খাড়ুয়া, খাড়ু—ইহা পায়ের গোড়ালিতে পরিবার উপযোগী কড়া শ্রেণীর অলঙ্কার বিশেষ। এখনও ইহার বহুল প্রচলন আছে। আকৃতিতে ইহা নানা প্রকারের হইত; তন্মধ্যে "তোড়ল খাড়ু" ও "সির খাড়ু"ই প্রসিদ্ধ। "তোড়ল খাড়ুর" উপরের পীঠ মসৃণ হয়, আর "সির খাড়ুর" উপরের পীঠ অষ্টভূজবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ছনলুয়া—ইহাও পদভূষণ। পদাঙ্গুষ্ঠে এক একটি আংটি দিয়া প্রত্যেক আংটিকে সরু পাঁচগাছি

তোড়ল খাড়ুয়া পাএ, অলুয়াত মাখি তাএ
যুজটানি চটি পদ সনে।
০ ০ *
মিলিয়া নলুয়া ছএ, চরণে সরণ লএ
রঙ্গেত মজিয়া মতি ভোলে।
(সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল—দোনা গাজী)

(গ) যথেক নৃপতি বালা, সাজায়েন্ত রতিকলা,
গলে শোভে মনি রত্ন হার।
সুবর্ণের নত নাকে. মণি রত্ন শোভে তাকে,
নানা পুষ্প শোভএ অপার।
কেসেত পাটের থোপা, গজ মুক্তা থোপা থোপা,
নানা মতে কেস বিলাসন।
কটিতে কিঙ্কিনি দোলে, পাএত পাঞ্জব বোলে,
চলনেতে করে ঝুন্ ঝুন্।
(ছেবল মুলুক শামারোখ—সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর)

শিখল দিয়া ষষ্ঠগাছির সহিত মিলাইয়া দিয়া পায়ের গোড়ালির সঙ্গে ষষ্ঠ শিখল দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইত। এখন এই অলঙ্কারের প্রচলন মুসলমানদের মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

চাম্পাফুল বা **চম্পা-কলি**—ইহা চম্পা ফুলের কলি সদৃশ করিয়া প্রস্তুত করা হইত এবং সূত্র সাহায্যে মালা গাঁথিয়া গলায় পরিধান করা হইত। কলিকাতার কোন কোন মুসলমান রমণী এখনও এইরূপ "চাম্পা-কলির" হার পরিধান করিতে দেখা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গের মুসলমান রমণীরা যে ভাবে বেশ-বিন্যাস করিতেন, তাহা এখন সমাজে খুব কচিৎ না হইলেও বড় বেশী দৃষ্ট হয় না। মুসলমানদের মধ্যে যুগ যুগ ধরিয়া সংস্কারের ফলে, তাহার অনেকগুলি একেবারে লোপ পাইয়াছে। বিশেষতঃ, যে সকল বেশ-বিন্যাসে হিন্দুয়ানীর গন্ধ একটু বেশী, তাহা আজকাল আর দেখা যায় না। পাদটীকায় (১) সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান-সাহিত্য হইতে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে এবিষয়ে আবশ্যক সংবাদ মিলিবে।

বেশ-বিন্যাস।

এই যুগে মুসলমান রমণীরা কপালে সিন্দুর-বিন্দু পরিধান করিতেন এবং তাহার কাছে একটী চন্দনের ফোটাও দিতেন। এখন বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে এই প্রথার প্রচলন নাই বলিলেও চলে। তবে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের কোন কোন মুসলমান রমণী এখনও কপালে সিন্দুর বিন্দু পরেন বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। ভ্রূ-যুগলে কাজল দিবার পূর্ব্বযুগীয় প্রথাও এখন বঙ্গে দেখা যায় না ; তবে ছোট ছোট বালক বালিকার ভ্রূ-যুগল এখনও নানা স্থানে কাজল-রঞ্জিত দেখিতে পাই। অগুরু, চন্দন, চূয়া, আতর ও গোলাপ জলে রমণীরা শরীর সুগন্ধ করিতেন ; এখন তাহা আর নাই। তৎস্থলে বিলাতী "এসেন্স" আজকাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং কদাচিৎ "আতর"ও লেপিত হয়। এই যুগের মুসলমান রমণী খোপাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া বাঁধিতেন। আজকাল এহেন খোপা বড় একটা দৃষ্ট হয় না। "জাদ" নামক এক প্রকার খোপাভূষণ পূর্ব্ববঙ্গে এখনও প্রচলিত আছে। এই "জাদ" দিয়া খোপাকে ভূষিত করা বিলাসিতার মধ্যে পূর্ব্বে গণ্য হইত কি না জানি না, এখন তাহা বিলাসিতার মধ্যে গণ্য। আজকাল কোন মুসলমান রমণী খোপায় পুষ্প ধারণ করেন না, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্প রমণীরা খোপায় ব্যবহার করিতেন।

(ঘ) "তাড়ল তোড়ল পরে বাহু বাজুবন।
কপালে সিন্দুর পরে দেবতা লক্ষণ।
নানা অলঙ্কার পরে পায়েত্তে নেপুর।"
(তমিম গোলাল)

(১) (ক) "আইস সোহাগিনী সই, মন রঙ্গে গীত গাই,
সেহেরা শোভিত শিরে লাল।
ঝলকে বাদলা তার, ঠামে ঠামে মুক্তাহার,
হৃদএ কাচলী ঝলমল।
কুচ মধ্যে শোভে পাটা, ঝলকে বিজলী ছটা"
(ছেবল মুলুক শামারোখ)

পোষাক-পরিচ্ছদ।

এই যুগে মুসলমান রমণীরা যে সকল পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, তন্মধ্যে এই কয়টির নাম জানিতে ও পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়—যথা :—

সেহেরা—ইহা অধুনিক "শাম্‌লা" জাতীয় লাল রঙ্গের এক প্রকার শিরোভূষণ। ইহা শোলা দ্বারাই তৈয়ার করা হইত এবং গঠনে ও আকৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের শিরস্ত্রাণের ন্যায় দেখাইত বলিয়া মনে হয়। আজকাল বাঙ্গালার কোথাও মেয়েদের এ শিরোভূষণের প্রচলন নাই। তবে কলিকাতা অঞ্চলে পশ্চিমা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর বিবাহে বরের মাথায় এহেন টোপর অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ইহাতে "বাদলা" দিয়া জড়ীর কাজ করা হইত বলিয়া, দূর হইতে দেখিতে ঝলমল করিত। বরেরা বাঙ্গালা দেশে ইহার পরিবর্ত্তে আজকাল "শাম্‌লা" মাথায় দেয়।

কাঁচলা, কাঁচুলী—ইহা মেয়েলোকেরা বক্ষ আবরিত করিবার জন্য ব্যবহার করিতেন। এখন বঙ্গের কোথাও কি হিন্দু কি মুসলমান কোন জাতির রমণী কাঁচুলী ব্যবহার করেন না। ইহা সংস্কৃত "কঞ্চলী" শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং ইহা ভারতের প্রাচীন পোষাক। বোধ হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে এই পোষাকের গাত্রে নানা প্রকার জড়ীর কাজ করা হইত। তাই ইহা বক্ষে "ঝলমল" করিয়া থাকিবে।

পাউ—ইহা আধুনিক "টাইট্ ব্রেষ্ট্" বা স্তন-বন্ধনীর অনুরূপ পোষাক। ইহা দ্বারা কেবল কুচ যুগলকেই রমণীরা বন্ধন করিয়া রাখিতেন বলিয়া মনে হয়। ইহাতেও নানাবিধ জড়ীর কাজ করা হইত; সেই জন্যই ইহা পরিধানে "ঝলকে বিজলী ছটা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

চুলিয়া—ইহা আজকাল পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ চট্টগ্রাম বিভাগে "চুলি" নামে পরিচিত। মেয়েলোকেরা এই পোষাকে গলা হইতে কোমর পর্য্যন্ত আবরিত করিতেন। ইহা মেয়েলোকের এক প্রকার "কোর্ত্তা" বিশেষ।

কোরতা, কোর্ত্তা—আজকাল বাঙ্গালার মুসলমান রমণীরা কোর্ত্তা পরিধান করেন না; বয়স্ক বৃদ্ধলোকেরাই মাঝে মাঝে ইহা পরিধান করিয়া থাকেন। পশ্চিমা মুসলমান মেয়ে এখনও কোর্ত্তা পরিয়া থাকেন। ইহাতে নানা প্রকারের বুটা থাকিত।

(খ) "(ান কোন সুবদনি, বস্ত্র অলঙ্কার আনি,
পৈরাএ আনন্দ কুহতুলে।
কেহ বান্ধে কার ঝুর, কেহ করে লই হার,
আনন্দে চুলিয়া দেএ গলে।
ললাটে সিন্দুর বিন্দু. অরুণ সহিতে ইন্দু
চন্দনের ফোটা তার কাছে।
জলদ কাজল রেখা ভুরু ইন্দ্র ধনু দেখা
সমজোক্ত বিরাজিআ আছে।
* * * *
সব অলঙ্কার জড়ি, বিচিত্র পাটের সাড়ি
উল্লাসে করএ পরিধান। (দোনা গাজী)

কাবাই—ইহাও "কোর্ত্তা" জাতীয় এক প্রকার পোষাক হইবে। এখন ইহার প্রচলন কুত্রাপি দেখি নাই। ইহার গাত্রেও বুটার কাজ করা হইত।

শাড়ী—পশ্চিমা মুসলমানদের ন্যায় বাঙ্গালার মুসলমান রমণীরা কখনও "পায়জামা" বা "পাজামা" পরিধান করিতেন কিনা জানি না, তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহারা "শাড়ী" পরিতেন বলিয়া জানিতে পারিতেছি। এই যুগে যে সকল "শাড়ী" পাওয়া যাইত, তন্মধ্যে "পাটের শাড়ী"ই অর্থাৎ পট্ট বা রেশম নির্ম্মিত "শাড়ীই" বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকিবে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের বহুস্থানে "পাটের শাড়ীর" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আজকালকার শিক্ষিতা ও শহুরে মেয়েদের ন্যায় শরীরের নানা স্থান উন্মুক্ত রাখিয়া সেকালে শাড়ী পরিবার ব্যবস্থা ছিল না। তখন "সব অলঙ্কার জড়ি, বিচিত্র পাটের শাড়ী" পরিবার অর্থাৎ মস্তক সহ শরীরের সমস্ত অংশ ঢাকিয়া শাড়ী পরিধান করিবার রীতি ছিল।

জামা—ইহা পুরুষদের পরিবার উপযোগী অঙ্গাবরণ বিশেষ। তবে আধুনিক জামার সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য ছিল কি না বলিতে পারা যায় না।

মুসলমানদের সঙ্গীত চর্চ্চা ও তাঁহাদের সমাজে বাদ্যযন্ত্রের বহুল প্রচলন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গের মুসলমান সমাজে নানাবিধ বাদ্য যন্ত্রের প্রচলন ছিল। এই সকল বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে বেশীর ভাগই এদেশীয় অর্থাৎ ভারতীয়; আর কতকগুলি পারস্য বা বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। মুসলমানদের মধ্যে এতগুলি বাদ্য-যন্ত্রের প্রচলন থাকায় মনে হয়, মুসলমানেরা সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চায় এই যুগে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। এই যুগে, মুসলমানেরা অনেক সঙ্গীত শাস্ত্রীয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। নানাবিধ সঙ্গীত রচনায়ও তাঁহারা পশ্চাৎপদ ছিলেন না। এই যুগের এহেন সঙ্গীত-সংগ্রহ ও সঙ্গীত শাস্ত্রীয় অনেক পুস্তক আমাদের নিকট আছে। সে যাহা হউক, এই যুগে মুসলমানদের মধ্যে যে সকল বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে; যথা—

(ক) "ঢাক, ঢোল, কাড়া যত কাঁশ, করতাল।
সানাই, বিগুল বাজে শুনিতে বিসাল॥

(খ) "কোরতা কাবাই অঙ্গে, বুটা শোভে নানা রঙ্গে,
আতর গোলাব চন্দন।
কন্যাকে পরাই সাড়ি মুকুতা কাঞ্চন জড়ি
চুড়া বান্ধে জাদের খোপন॥

* * *

পিন্দাই ভূষন বেস, তুলিআ বান্ধিল কেস,
জেন চুড়া বান্ধিল কানাই।
কি কব চুড়ার সাজ, দিআ পুষ্প গজরাজ,
জার গন্ধে গুঞ্জরে ভ্রমাই॥

(ছেবল মুলুক শামারোখ)

দোসরি, বাঁসরি বাজে বাজায় মোরচঙ্গ।
দোতারা, সারিন্দা বাজে করি নানারঙ্গ ॥
সারঙ্গ, মোহরি বাজে সুস্বর করি রাও।
যুবক যুবতি সুনি উল্লসিত গাও ॥
বীণা, বেনু, মধুবাঁসি, বাজাএ তোগর।
বিরহিনি কিবা শক্তি রহিবারে ঘর ॥
নানা পক্ষি সুর ধ্বনি করে নানা রব।
রাজকন্যা ছিল্লালের বিভার উৎসব ॥
নানা সব্দে বাদ্য বাজে সুনি সুললিত।
নাচএ নৃত্যকি সব গাহি সাদি গিত ॥
মৃদঙ্গ, মন্দিরা বাজে বাজাএ তম্বুরা।
খঞ্জরি, ঝাঞ্জরি বাজে বাজাএ ডম্বুরা ॥
রবাব, ভেউল বাজে, বাজে কবিসাল।"
(তমিম গোলাল)

(খ) "দুই সৈন্য মুখামুখি হই গেল জবে।
বিবিধ বাদিত্য ধ্বনি উঠি গেল তবে ॥
ঢাক, ঢোল, কাড়া, সিঙ্গা, দোসরি, মোহরি।
কাঁশ, করতাল, শঙ্খ, ডমরু, ঝাঁঝরি ॥
মোরছা, থামচ, পটা, ভৈউর, কর্ত্তাল।
সাজি সাজি সানাই, বুগুল বাজে ভাল ॥
কম্পিত পৃথিবি ভেল দুন্দুভির ধ্বনি।
হস্তি কান্ধে দমা বাজে ঘোরনাদ সুনি ॥
বাজিল বিজয়রোল, তবল, নিসান।
দগড়েত দিল কাঠী ভুমি কম্পমান ॥
(মকতুল হোসেন)

(ঘ) কপালে সিন্দুর পরে দেবতা লক্ষণ।"
(তমিম গোলাল)

(ঙ) "নিজ হস্তে নরপতি কুমার সাজাএ।
সুগন্ধি আতর জামা অঙ্গেত পরাএ ॥
* * *
মহাদেবী নুরবানু হরিষ অন্তর।
সাড়ির অঞ্চল ধরে শিরের উপর ॥
সুগন্ধি আতর আর গোলাব চন্দন।
সখিগণ অঙ্গ পরে করন্ত লিপন ॥
(তমিম গোলাল)

(গ) "দুমদুমি, টিকারা, ঢোল, নাকারার কোলাহল,
সানবিনা, ফরিসিঙ্গা, বাঁসি।
ঝাজ, কাঁস, করতাল, তাম্বুরা, জম্বুরা ভাল,
চারিভিতে শুনিতে উল্লাসি॥
দোসরি, মোসরি, বীণা সবামুতক্ষরি (?), দোনা,
সর্ব্বরঙ্গি সুরঙ্গ বাজন।
বিপঞ্চ, রবাব শুনি, মৃদঙ্গ, সারিন্দা, ধ্বনি,
কবিলাস গাহে সর্ব্বজন॥
(দোনা

(ঘ) "সুর ঢক্কা বাজে সব্দ হইল চারিভিত।
চামরেত ভূমিকম্প হৈল আচম্বিত॥
দোতারা, সেতারা বাজে মৃদঙ্গ, ঝাঁঝর।
রামসিঙ্গা, নহবত বাজে হাজারে হাজার॥
ঢাক, ঢোল, কাড়া, সিঙ্গা, কাংস, করতাল।
দোসরি, মোহরি বাজে ভৈউর, কর্ণাল॥
(জেবল মুলু' শামারোখ)

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সমাজে বহুবিধ আতস-বাজীর প্রচলন ছিল। নানা আনন্দ উৎসবের সময়, বিশেষতঃ বিবাহের কালে, পর্ব্বে বা পুণ্যাহে এই সকল আতস-বাজীর শ্রাদ্ধ হইত। এখনও এহেন সময়ে আতস বাজী জ্বালাইবার প্রথা বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে বহু প্রচলিত। মুসলমানেরাই ভারতে আতস বাজীর আমদানী করেন; কিন্তু এদেশে আসিয়া আতস-বাজী রকমারি রূপ গ্রহণ করে। ফলে, সপ্তদশ শতব্দীর আতস-বাজীতে অনেক বাঙ্গালা নাম দেখিতে পাই। এই সমুদয় আতস-বাজীর অনেকগুলি এখন লোপ পাইয়াছে; তাই ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতির সহিত আমরা পরিচিত নহি। নিম্নোদ্ধৃত অংশে এহেন অধুনা-লুপ্ত অনেক আতস-বাজির পরিচয় পাওয়া যায়; যথা—

আতসবাজী।

"ভূমিচাম্পা, সিতাহার বেঙ্গা, মেড়া, গজ আর,
কুম্ভির, চাদর সারি সারি।
অপরাজিতা, রাধাচক্র, রাক্ষস, দানব, বক্র,
রাজসব যত ফুলছরি॥
চতুর্ভুজ, সাহাভুজ, কন্দিলে নিন্দিল সূর্জ,
রোসন-মন্দির সাহাজাল।
হাওই, রোসনতরা, লৈক্ষ লৈক্ষ গোতাহারা,
সভামণ্ডলে সোভে ভাল॥
(দোনা গাজী)

উপর্য্যুক্ত আতস-বাজীগুলিতে "ভূমিচম্পা", "কুম্ভীরবাজী", "চাদরবাজী" "রাধাচক্র", "ফুলছড়ি", "হাওই" ও "রোসনতারার" প্রচলন এখনও বঙ্গের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। অপর আতস-বাজীগুলি অধুনা লুপ্ত হইয়াছে ও তৎস্থলে অনেক নূতন বাজীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই যুগে আর এক প্রকারের আতস-বাজী ছিল; ইহার নাম ছিল "পরীবাজী"। এই বাজীর সম্বন্ধে জানা যায়ঃ—

"ছাড়ি দিল পরিবাজি জেন উরে পরি।
তিমির দিবস করি চলে সবে ঘিরি॥"
(তমিম গোলাল)

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে বহু কুসংস্কারমূলক প্রথার প্রচলন ছিল; ইহাদের অনেকগুলি এখনও সমাজে দৃষ্ট হয়। তবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে মুসলমানদের মধ্যে সংস্কার-প্রচেষ্টার ফলে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এখন এই সমুদয় কুসংস্কারমূলক প্রথার অনেকগুলি লোপ পাইয়াছে বা পাইতেছে, কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে এখনও এ সমুদয় কুসংস্কারের অনেকগুলি বাঁচিয়া রহিয়াছে। সে যাহা হউক, এই যুগের মুসলমানদের মধ্যে যে সকল কুসংসস্কারমূলক প্রথার প্রচলন ছিল, তাহার কোন কোনটির বিষয়, আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সাহিত্য হইতে অবহিত হই। পাঠক-গণকে নিম্নে এহেন কয়েকটি সামাজিক কুসংস্কারের সন্ধান দিলাম।

বহুবিধ কুসংস্কারমূলক প্রথা।

(১) ইতিপূর্ব্বে বিবাহের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সামান্য আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই যুগে বিবাহের আরও এমন কতকগুলি সংস্কার ছিল, যাহা শাস্ত্রীয় ইস্‌লাম্ কোন দিনই অনুমোদন করিবে না। এই সমুদয় সংস্কার এইরূপঃ—

(ক) বর বরণ—এই যুগে কনের বাড়ীতে নানা বস্ত্র-অলঙ্কার পরিহিত রমণীরাই বরকে বরণ করিতেন। এই রমণীরা অঙ্গে সুগন্ধ চন্দন মাখিতেন, এবং হেলিয়া চলিয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে বিহার করিতেন। বরের সম্মুখে একটি মাঙ্গলিক প্রদীপ রাখিয়া ও যৎসামান্য ধান্য-দূর্ব্বা সাজাইয়া তাহাকে নানাবিধ আমোদ প্রমোদের মধ্যে বরণ করা হইত (১)।

বর বরণ।

(খ) কনে বরণ—কনেকে বরণ করিবার প্রথা ও সংস্কার একটু পৃথক ছিল। কনেকে

---

(১) "সাজে জত সোহাগিনি, বরিতে কুমার মণি
পরিধানে নানা অলঙ্কার
বসনে কুসুম রঙ্গ, সুগন্ধি চন্দন সঙ্গ,
হেলি চলি করন্ত বিহার॥
সমুখে প্রদীপ থুইয়া, ধান্য দুর্ব্বা সাজাইয়া
বরিলেন্ত চামরি রাজন।
(শামারোথ)

বরণ করিবার জন্য পাট শ্রেণীর একটি "মাড়োয়ার" প্রস্তুত করা হইত। ইহার পাশে আনিয়া কনেকে দাঁড় করান হইত এবং বর-বরণের ন্যায় ধান্য-দূর্ব্বা-প্রদীপ সাজাইয়া দেওয়া হইত। ইতিপূর্ব্বেই, তথায় পুণ্য ঘট বসান ও চারিটি রামকলা দেওয়া হইত। তারপর নব-দম্পতিকে "মাড়োয়ার" মধ্যে বসাইয়া, মঙ্গল ধ্বনি করিয়া, "সহলা" নামক মেয়েলি গান গাহিয়া, ঘোম্‌টা তুলিয়া মুখ দেখান হইত। এই সময়ে গাড়ু হইতে দম্পতির শিরে আশীষবারি সিঞ্চন করা ও দূর্ব্বাদল উপহার দেওয়া হইত। (১)

কনে বরণ।

(গ) তেলোয়াই ;—ইহাও একটি বিবাহ-সম্পর্কিত প্রথা। চট্টগ্রাম বিভাগের নানা স্থানে এই প্রথাটি এখনও প্রচলিত আছে। বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্বে কনের পিতা বরের বাড়ীতে একদফা উপহার পাঠাইয়া থাকেন। ইহাকেই "তেলোয়াই" দেওয়া বলে। এই একদফা উপহারে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী থাকে বটে, কিন্তু একটি "পানের ঝাড়"ই সবচেয়ে প্রধান বস্তু বলিয়া পরিগণিত হয়। সাধারণতঃ, একটি পত্রযুক্ত নাতি বৃহৎ আম্রডালের প্রতি পত্রে এক একটি পানের খিলি বা একটি পত্রে একাধিক পানের খিলি টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। তাহা একটি মজুর কাঁধে করিয়া বরের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয়। বরের বাড়ীর সকলেই ঐ ঝাড় হইতে পান লইয়া খায়, এবং তাহার পান পাড়ায় বিলাইয়া দেওয়া হয়। অবিকল এই প্রথাটি পূর্ব্বেও ছিল, সন্দেহ নাই :—

তেলোয়াই।

"হেন মতে তেলোয়াই করে সাধুবরে।
পানফুল ফিরাঅন্ত প্রতি ঘরে ঘরে ॥"
(নছিরা নামা—মরদন)

(১) কুমারি বরিতে আনি, আগে দিল সোহাগিনী,
মাড়ওয়ার পাশেত আনিয়া।
ঘৃতের দিআটি ধরি জতেক জুবতি নারি
ধান্য দূর্ব্বা দিল তুষ্ট হৈআ ॥
চারি গাছ রাম কলা, পুণ্য ঘট বসাইলা,
রাজা রতি তাতে বসাইল।
সহলা মঙ্গলা বলি, ঘোমটা বসন তুলি,
চন্দ্র সম মুখ দেখাইল ॥
গাড়ুআ লইআ হাতে, মারেন্ত ঘোহান মাথে
আনন্দেত পুলকিত মন।
সখিগণ দূর্ব্বা দিআ, রবি-সসি মিলাইআ,
অন্তর হৈল সখিগণ ॥
(শামারোখ)

২। **অধিবাস**—বিবাহের পূর্ব্বে অধিবাস-পালনের প্রথা এই যুগের মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; এখন বাঙ্গালার কোথাও মুসলমানদের মধ্যে ইহার প্রচলন আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। মোহাম্মদ রাজার "তমিম গোলাল" নামক পুস্তকে দেখিতে পাই:—

অধিবাস।

"অধিবাস রাত্রি আন অধিক উল্লাস।
সখিগণে নাচে গায় ফিরি চারি পাস॥"
(তমিম গোলাল)

৩। **মঙ্গল ঘট**—আজকাল যেমন হিন্দুদিগের মধ্যে পূজা-পার্ব্বণে বা আনন্দ-উৎসব-কালে দ্বারে দ্বারে মঙ্গল কলস ও ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া ঘট দান করিবার প্রথা দেখিতে পাই, পূর্ব্বে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতেও মুসলমানদের মধ্যে ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া ঘট দিবার প্রথা বর্ত্তমান ছিল। জানিতে পারিয়াছি, বাঙ্গালার নানা স্থানের অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এখনও মঙ্গল ঘট দিবার প্রথা বিদ্যমান আছে। সুতরাং মুসলমানেরা এখনও যে প্রাচীন সামাজিক প্রথা পালন করিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রমাণ পাই:—

মঙ্গল ঘট।

"ঘর দ্বারে আইসে জদি চামরি ঈশ্বর।
ধান্য দুর্ব্বা ঘট দিআ নিল অন্তপুর॥"
(শামারোখ)

৪। **শুভাশুভ**- এই যুগের মুসলমানেরা বাহ্যবস্তু দর্শনে শুভাশুভের পূর্ব্ব সঙ্কেত মনে করিয়া সুখী বা দুঃখিত হইতেন তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, কোথাও যাত্রাকালে পথিপার্শ্বে আম্রডাল দিয়া জলপূর্ণ কুম্ভ রাখিলে অর্থাৎ মঙ্গল কলস বসাইলে, দৈবাৎ সম্মুখে দুগ্ধদান রত বৎসা ধেনু, দক্ষিণে ভুজঙ্গ ও বামে শৃগাল দেখিলে, এবং দধির পশার মাথায় গোপ রমণী দর্শন করিলে যাত্রা নিশ্চয়ই শুভ এবং ইহার বিপরীত ঘটিলে অশুভ হইয়া থাকে। তাই দেখা যায়:—

শুভাশুভ।

"এরাকি তুরকি নানা আর কত তাজি। গজ অশ্বে আরোহিলা চলিলেক সাজি॥
কুম্ভ দুই জল ভরি পন্থ দুই পাশে। আম্র ডাল দিআ তাতে রাখিছে হরিসে॥
সমুখে ধেয়ন গাভী বাচ্ছা দুধ খাএ। দক্ষিণে ভুজঙ্গ চলে বামে সিবা ধাএ॥
দধির কলসী লইআ গোপের রমণী। হরসিতে মহারাজ সুভযাত্রা জানি॥"
(শামারোখ)

৫। **ভূত-প্রেত**—বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান এখনও ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে এবং মানবের উপর তাহাদের প্রভাবে সমভাবে বিশ্বাসপরায়ণ। তবে, অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ও বিজ্ঞানের কল্যাণে, এই বিশ্বাস পূর্ব্ব হইতে অনেকটা কমিয়া আসিতেছে। মধ্যযুগে মুসলমানগণ এ বিশ্বাস পোষণ করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, মানুষের উপর দৈত্যের

ভূত-প্রেত।

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

ল

স

হ

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা		পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
১০	...	১৫	মন্ত্রীপদ	...	মন্ত্রিপদ
১৬	...	১	তুতী	...	দূতী
২০	...	৪	যইল	...	হইল
২৯	...	৩	অলাওলের	...	আলাওলের
৩২	...	২০	পরস্পরায়	...	পরম্পরায়
৩৪	...	৪	মন্ত্রীপদ	...	মন্ত্রিপদ
৩৮	...	১৪	লাবন্যবতী	...	লাবণ্যবতী
৩৯	...	১৫	মন্ত্রী-তনয়	...	মন্ত্রি-তনয়
,,	...	২৩	ঐ	...	ঐ
,,	...	২৭	মন্ত্রী-পুত্র	...	মন্ত্রি-পুত্র
৪০	...	১৭	পরামর্থ	...	পরামর্শ
৪২	...	২৬	মন্ত্রী-পুত্র	...	মন্ত্রি-পুত্র
৪৩	...	১১	পরম	...	পঞ্চম
,,	...	১৬	তাহাকে	...	তাঁহাকে
৪৪	...	৭	বাঙ্গলা	...	বাঙ্গালা
,,	...	১৩	অবির্ভাবে	...	আবির্ভাবে
৪৫	...	৩২	বিখাত	...	বিখ্যাত
৪৬	...	২৬	প্রথমিক	...	প্রাথমিক
৪৭	...	১	লুণ্টন	...	লুণ্ঠন
,,	...	১৮	তাহার	...	তাঁহার
,,	...	,,	ছিল	...	ছিলেন
,,	...	২৭	বিতারিত	...	বিতাড়িত
৪৮	...	২০	তাহার	...	তাঁহার
৪৯	...	১	প্রচীন	...	প্রাচীন
৫০	...	৯	অমিমাংসিতই	...	অমীমাংসিতই
৫১	...	৭	বৃত্যান্ত	...	বৃত্তান্ত
৫৩	...	৬	তাহার	...	তাঁহার
,,	...	১০	তাহার	...	তাঁহার
,,	...	১৫	অশ্রয়দাতার	...	আশ্রয়দাতার
,,	...	২২	তাহার	...	তাঁহার
৫৪	...	১	অনুমানিক	...	আনুমানিক
,,	...	৪	ঐ	...	ঐ
,,	...	১১	প্রচীন	...	প্রাচীন

পৃষ্ঠা		পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
৫৫	...	৬	এই৷	...	ইহা
,,	...	২৯	অত্যচার	...	অত্যাচার
,,	...	৩০	বদিলা	...	বাদিলা
৫৭	...	২	আন্যান্য	...	অন্যান্য
৫৯	...	১১	অনাবশ্যকীয়	...	অনাবশ্যক
৬০	...	১	বাঙ্গলা	...	বাঙ্গালা
,,	...	১	চিরস্মরনীয়	...	চিরস্মরণীয়
,,	...	২	বাঙ্গলা	...	বাঙ্গালা
,,	..	৪	ঐ	...	ঐ
,,	...	৯	ঐ	...	ঐ
,,	..	১৩	ঐ	...	ঐ
,,	...	১৬	আধ্যাতিক	...	আধ্যাত্মিক
৬১	...	৬	শপ্তদশ	...	সপ্তদশ
,,	...	১২	বাঙ্গলা	...	বাঙ্গালা
,,	...	১৩	ঐ	...	ঐ
,,	...	২২	ঐ	...	ঐ
,,	...	,,	তাহাদের	...	তাঁহাদের
৬২	...	১	বদীউজ্জমান	...	বদীউজ্জমাল
৬৩	...	২৫	পদ্মপুরাণ	...	পদ্মা-পুরাণ
,,	...	২৯	দেবদেবিগণ	...	দেবদেবীগণ
৬৪	...	৬	গীথিকাগুলিতে	...	গীতিকাগুলিতে
,,	...	১৩	দারোদ্ঘাটন	...	দ্বারোদ্ঘাটন
,,	...	২৩	রিরুদ্ধে	...	বিরুদ্ধে
৬৫	...	৩	তাহাদের	...	তাঁহাদের
,,	...	৮	অনুবাদিতব্য	...	অনূদিতব্য
৬৬	...	১১	সন্মুখে	...	সম্মুখে
,,	...	১৩	বাঙ্গলা	...	বাঙ্গালা
,,	...	১৭	ঐ	...	ঐ
,,	...	২০	সাক্ষ্যাৎভাবে	...	সাক্ষাৎভাবে
,,	...	২১	সর্ব্বোতোমুখী	...	সর্ব্বতোমুখী
৬৭	...	২	রাজানুগ্রহে	...	রাজানুগ্রহ
,,	...	৫	মচিব	...	সচিব
,,	...	১২	পঞ্চদশ হইতে		পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে
৬৮	...	৮	অক্ষুন্ন	...	অক্ষুণ্ণ
৬৯	...	১২	অধ্যায়	...	অধ্যায়ে
,,	...	১৬	ইহাদের	...	ইঁহাদের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
[illegible]	২৮	তাহার	তাঁহার
[illegible]	৯	মহিআছোয়ার	মাহিআছোয়ার
[illegible]	২৪	উপখ্যান	উপাখ্যান
[illegible]	১২	উপলব্ধি	উপলব্ধ
[illegible]	১০	প্রঞ্জলতা	প্রাঞ্জলতা
[illegible]	১২	এই একটি	কয়েকটি
[illegible]	১৪	আসিবে	আসিয়ে
”	২৩	তাঁহা	তাহা
”	২৯	তাহার	তাঁহার
৭৯	২৫	ফরসী	ফারসী
৮০	৬	অঙ্গুষ্ট	অঙ্গুষ্ঠ
৮৩	১৬	মধ্যে মধ্যে মধ্যে	মধ্যে মধ্যে
”	১৬	বিভৎস	বীভৎস
৮৪	৪	নহে	নহেন
”	২১	অধিশ্বরী	অধীশ্বরী
”	২৭	হোসেনের	হাসনের
”	৩০	বর্ণিতব্য	বর্ণিত
৮৫	৬	সৃজিত	সৃষ্ট
”	১৪	ইত্যাধিক	ইত্যধিক
”	১৮	গোড়াইতে	গোড়াতেই
”	২০	উল্লেখ	উল্লেখ
৮৯	১৪	চাপিয়া	চাপাইয়া
”	২৭	আত্মহুতি	আত্মাহুতি
৯০	৩	অ।স্তাব	আপ্তাব
”	২৪	অনাবশ্যকীয়	অনাবশ্যক
”	৩০	বাঙ্গলা	বাঙ্গালা
৯১	৩০	পরাম্পরায়	পরম্পরায়
৯২	২	মুললমান	মুসলমান
৯৩	২০	উন্মিলিত	উন্মীলিত
”	২১	পবিত্রিকৃত	পবিত্রীকৃত
৯৪	১০	অন্তর্জাতিক	আন্তর্জাতিক
”	১১	ঐ	ঐ
৯৬	২৫	বাঙ্গলা	বাঙ্গালা
১০৭	৪	রমণী	রমণীকে
১০৮	২১	শতব্দীর	শতাব্দীর